আমার যুদ্ধ

ইমদাদুল হক মিলন

সইয়ের বাড়িতে বসে খবরটা মা পেয়ে গেল।

আমাদের বাড়ি লুট হয়ে গেছে। গ্রামে মিলিটারি এসেছে, জ্বালাও পোড়াও করেছে, মানুষ মেরেছে। কিন্তু আমাদের বাড়িটা মিলিটারিরা লুটপাট করেনি।

কে করেছে?

লুট হয়ে যাওয়া বাড়িতে ফিরেই আমি তা জেনে গিয়েছিলাম।

তখনও দুপুর হয়নি।

লুট হয়ে যাওয়া বাড়ির আঙিনায় বসে শিশুর মতো কাঁদছি। অদূরে লুটের হাত থেকে বেঁচে থাকা আমাদের একমাত্র সম্পদ মায়ের কোরআন শরীফটা রেহালের ওপর রাখা।

আমি কাঁদছিলাম সেই দিকে তাকিয়ে।

দুপুরের পর পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এলো মা। চার পাঁচমাইল দূরের পুস্বাইলে গ্রাম থেকে ছুটতে ছুটতে এসেছে। ঈশ্বরগঞ্জে মিলিটারি এসেছে, যেকোনও আপদ হতে পারে রাচ্চায়, মা সেইসব কেয়ারই করেনি। তার পরনে সস্তা ধরনের একটা প্রিন্টের শাড়ি। বাড়িতে ঢুকে দেখে মাটিতে অসহায় ভঙ্গিতে বসে কাঁদছি আমি। প্রথমেই আমার দিকে তাকালো না মা। চারদিক তাকিয়ে ফাঁকা শূন্য বাড়িটা দেখলো। রেহালের ওপর রাখা কোরআন শরীফটা দেখে ছুটে গিয়ে সেই কোরআন শরীফ বুকে চেপে ধরল।

তারপর তাকালো আমার দিকে।

একহাতে বুকে ধরা কোরআন শরীফ, অন্যহাত রাখল আমার মাথায়। কান্দিস না বাজান, কান্দিস না। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর।

Munshigonj.com

মাকে দেখে আমার কান্না আরও বেড়ে গেছে। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমগ কিছু নাই মা। আমরা পথের ফকির হইয়া গেছি।

মা আবার সেই কথা বলল, ধৈর্য ধর।

পথে আসতে আসতে মা বোধহয় খবর পেয়ে গিয়েছিল কে লুট করেছে আমাদের বাড়ি।

সেই বদমাশ কেরামত আলীর ভাই। লোকটার নাম আক্কাস আলী।

কোরআন শরীফ বুকে নিয়ে আক্কাসের বাড়িতে গেল মা। গিয়ে দেখে আমাদের বাড়ির টিন কাঠ খাট চৌকি চেয়ার টেবিল এমনকি হাঁড়িপাতিল থালাবাসন পর্যন্ত আক্কাসের বাড়ির উঠানে। আক্কাস আর তার বড়ভাই কেরামত দুজনে আমাদের দুটো চেয়ার নিয়ে বসে আছে।

মা গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াল। আক্কাস এইটা তুমি কি করছ? আমার বাড়ির ঘরদুয়ার সব লুট করলা?

আক্কাস না, কেরামত কেলানো একটা হাসি হাসল। আমরা তো লুট করি নাই। লুটের হাত থিকা বাঁচাইছি।

কেমনে বাঁচাইলা? আমার বাড়ির সব জিনিস দেখি তোমগ উঠানে পইড়া রইছে।

সব আপনের না মামানী।

তয় কার?

এই উঠানে যেইসব জিনিস দেখতাছেন, এইসব জিনিস এই পাড়ার আরও কয়েকজন মাইনষের। যাগো যাগো বাড়ি লুট হইতেছিল, সেইসব বাড়িতে গিয়া লুটতরাজ করা মানুষগ আমরা ঠেকাইছি। তাগো হাত থিকা জিনিসপত্র যতটা রক্ষা করতে পারছি, সব এই বাড়িতে লইয়া আইছি।

কও কী?

এবার কথা বলল, আক্কাস। হ মামানী, আমার আপনের লগে মিছাকথা কই না।

মা চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে আমাদের বাড়ির সব জিনিস আক্কাসের বাড়ির উঠানে। তারপরও তারা বলে ওইসব জিনিস নাকি আমাদের না!

মা অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক করল তাদের সঙ্গে। কাজ হলো না, মার কথা ওরা পাত্তাই দিল না।

শেষপর্যন্ত মা বলল, তোমরা কী কইতে চাও উঠানের এইসব জিনিসের মধ্যে কিছুই নাই আমার?

কেরামত বলল, আছে।

Munshigonj.com

কী আছে?

আপনের বাড়ির ছয়খান টিন আছে।

মাত্র ছয়খান টিন?

হ। লুটতরাজকারীদের হাত থিকা আপনের বাড়ির মাত্র ছয়খান টিনই আমরা বাঁচাইতে পারছিলাম। আপনের ছয়খান টিন আপনে লইয়া যান।

মা আর কোনও কথা বলল না, বাড়িতে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। মা আর আমি চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ধরাধরি করে ছয়টা টিন নিয়ে এলাম বাড়িতে। ওই ছয়খানা টিনই তখন আমাদের সম্বল, আর কিচ্ছু নেই। মার পরনে প্রিন্টের সচ্চা একটা শাড়ি। আমার পরনে হাঁটুর কাছে ছেঁড়া ফুলপ্যান্ট, আর কোড়া রঙের অতি পুরনো একটা স্যান্ডোগেঞ্জি।

মনে আছে, ছেঁড়া প্যান্টটার রঙ ছিল খয়রি।

ততোক্ষণে বিকেল হয়ে গেছে।

আমাদের খাওয়া হয়নি কিছুই। কোত্থেকে হবে, বাড়ির কোথাও তো কিছু নেই। সবই তো লুট হয়ে গেছে। আমার চোখের পানি আর ফুরায়ই না, শুধু ভাইয়ের কথা মনে হয়। কোথায় আছে আমার বড় ভাই, ভাবী আর ছোটবোন? কোথায় আছে আমার সেই বাউণ্ডুলে মেজোভাই, কে জানে? বেঁচে আছে , না মরে গেছে সবাই তাই বা কে জানে? যে বাড়িতে, যে ঘরের চার দেয়ালের মাঝখানে, মাথার ওপর রোদ বৃষ্টি ঠেকাবার চালা ছিল যে ঘরে, সেই ঘরের ভিতর জড়াজড়ি করে বড় হওয়া, জড়াজড়ি করে বেঁচে থাকা মানুষগুলো আজ কে কোথায়? পাকিস্তানী জন্তুগুলো হামলার পর হামলা চালিয়ে কোথায় কীভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে আমাদেরকে। তাদের হামলার সুযোগে আমাদের কিছু নিজস্ব মানুষও নিঃস্ব করে দিয়েছে আপনজনকে।

অন্যদের কথা আমি তখন ভাবতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম শুধু আমার আর আমার ওই দুঃখিনী মায়ের কথা।

এই দুজন মানুষ আমরা বাঁচবো কী করে?

মাথা গুঁজবো কোথায়?

খাবো কী?

পরবো কী?

বুকে কোরআন শরীফটা মা ধরেই রেখেছেন। এই অবস্থায় আমাদের একমাত্র অবলম্বন ওই পবিত্র গ্রন্থ। যেন এই গ্রন্থই যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে, ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করবে অসহায় মা এবং ছেলেকে।

Munshigonj.com

আমার কান্না থামে না দেখে মা আমাকে বুঝাতে লাগল, এইভাবে কান্দিস না। কান্দন থামা। এইটাও আলস্নাহর একটা পরীক্ষা। আলস্নাহপাক বিপদ আপদ দিয়া তার বান্দাগো পরীক্ষা করে। ধৈর্য ধর, আলস্নাই পথ দেখাইবো।

ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

কোথায় রাত কাটাবো আমরা?

চারপাশের যেকোনও বাড়িতে গিয়েই রাত কাটাতে পারি। কোনও বাড়িতেই সেভাবে লোকজন কেউ নেই। বেশির ভাগ বাড়িই খালি পড়ে আছে। যেকোনও একটাতে গিয়ে উঠলেই হয়।

মা বলল, নিজের বাড়ি ছাইড়া আমি কোনখানে যামু না।

আমি অবাক! তাইলে থাকবা কই?

এই বাড়িতেই থাকুম।

এই বাড়িতে তো ঘরদুয়ার কিচ্ছু নাই?

তারপরও এই বাড়িতেই থাকুম।

গ্রামে যখন তখন আসতে পারে মিলিটারি। গুলি করে আর বাড়িঘরে আগুন দিয়ে মারতে পারে সবাইকে। এসব শোনার পর থেকে প্রত্যেক বাড়িতেই বড় বড় গর্ত করা হয়েছিল, অর্থাৎ ট্রেঞ্চ করা হয়েছিল। থানাঅলারা আর গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকের বুদ্ধি পরামর্শে প্রত্যেক বাড়িতে ট্রেঞ্চ করেছিল লোকে। আমাদের বাড়িতে বড় একটা ট্রেঞ্চ করেছিলাম আমি। অনেকটা কবরের আকৃতি। বাড়ির পিছন দিকটায়। ভিতরে বসে থাকলে বাইরে থেকে দেখে মিলিটারিরা যেন কিছু অনুমান করতে না পারে এইভাবে করেছিলাম ট্রেঞ্চটা। ঝোঁপঝাড়ের ভিতরে ট্রেঞ্চ করে তার ওপর আড়াআড়ি করে বাঁশ ফেলে বাঁশের ওপর চালার মতো করে দিয়েছিলাম বাঁশের তৈরি একটা বেড়া, তার ওপর কয়েক ঝুড়ি মাটি আর মাটির ওপর কিছু ঝোঁপঝাড়। একদিককার মুখ ফাঁকা। সেই দিক দিয়ে ট্রেঞ্চে নামা যাবে। ওই মুখটার ওপর ফেলে রেখেছিলাম আলগা একটা বেড়া। ট্রেঞ্চে নেমে সেই বেড়া টেনে দিলে বোঝা যাবে না এর ভেতর মানুষ আছে কী না?

মা বলল, রাতটা আমরা ওই গর্তে কাটামু।

শুনে আমি চমকে উঠলাম। কও কী তুমি?

হ।

ওই রকম জায়গায় সারারাত বইসা থাকতে পারবা?

পারন্নম। তুই পারবি কী না সেইটা ক?

Munshigonj.com

তুমি পারলে আমিও পারুম।

তয় আর চিন্তা নাই।

কিন্তু খাইবা কী? খাওনের তো কোনও পথ দেখতাছি না।

কাইল সকাল পর্যন্ত না খাইয়া থাকন লাগবো। পারবি না?

আমি কাতর গলায় বললাম, আমার তো অহনই খিদায় পেট জ্বইলা যাইতাছে।

মা বলল, ধৈর্য ধর বাজান, ধৈর্য ধর। একটামাত্র রাইত। পেটের খিদা চাইপা রাখি। কাইল আল্লাহপাক কোনও না কোনও ব্যবস্থা করবোই। খিদা সহ্য করতে না পারলে চাপকল থিকা পানি খাইয়া আয়।

আমাদের বাড়িতে পুরনো একটা চাপকল ছিল। সবই লুট হয়ে গেছে, চাপকলটা লুট হয়নি। আক্কাসের চোখে চাপকলটা বোধহয় পড়েইনি। পড়লে মাটির তলার পাইপ পর্যন্ত টেনে তুলে নিয়ে যেত।

মার কথায় চাপকলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একহাতে চাপকল টিপে, অন্যহাতে অনেকক্ষণ ধরে পানি খেলাম। গাল মুখ চটচটে হয়েছিল চোখের পানিতে। চাপকলের ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখটা খুব ভালো করে ধুয়ে ফেললাম। ময়লা স্যান্ডোগেঞ্জি মুখের কাছে তুলে মুখ মুছতে মুছতে এলাম মার কাছে।

মার বুকে তখনও কোরআন শরীফ। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাচ্ছে চারদিকে। মার হাত ধরে ট্রেঞ্চে গিয়ে নামলাম। প্রথমে নামালাম মাকে। তারপর নিজে নেমে আলগা ঝাপটা টেনে দিলাম ট্রেঞ্চের মুখে। মুহূর্তে গভীর গভীরতর এক অন্ধকার জগতে চলে গেলাম।

মৃত্যুর জগৎ কী ঠিক এই রকম না?

কবর কী ঠিক এই রকম না?

এই রকম অন্ধকার আর নির্জন?

জীবিত মানুষের কবরবাসের অভিজ্ঞতা কী রকম কেউ তা জানে কী না জানি না। আমি আমার কবরবাসের অভিজ্ঞতা টের পেলাম সেই রাতে।

ট্রেঞ্চের এককোণে বুকে কোরআন শরীফ জড়িয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে মা। মাঝখানে বিঘত পরিমাণ ব্যবধান, আমি বসে আছি। দুজন মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ টের পাই দুজনে। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলি না।

কবরে থাকা মানুষ কী কথা বলে?

Munshigonj.com

মা সবসময় দোয়া পড়েন একটু শব্দ করে। সেই রাতে সেই কবরের অন্ধকারে বসে মা কোনও শব্দ করছিল না। বুকে জড়ানো কোরআন শরীফ নিয়ে আলস্নাহকে মা ডাকছিল নিঃশব্দে। ডাকতে ডাকতে ক্লান্স্ত হয়ে যাচ্ছিল।

আলস্নাহকে ডাকছিলাম আমিও। মায়ের মতো নিঃশব্দেই ছিল সেই ডাক। এই করে করে ঘুম এবং জাগরণের মাঝখানকার একটা অবস্থা তৈরি হলো দুজনেরই। নাকি ওই অবস্থাটাকে বলে জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানকার অবস্থা?

এই অবস্থা কাটলো ভোররাতের দিকে।

সারারাত আমাদের চারপাশে কোথাও কোনও শব্দ ছিল না। ছিল মাটির তলার নৈঃশব্দ। সেই প্রথম আমি আবিষ্কার করেছিলাম নৈঃশব্দের ভিতরেও থাকে এক রকম শব্দ। সেই শব্দ জীবনের শব্দ না, সেই শব্দ মৃত্যুর শব্দ।

মৃত্যুর শব্দ থেকে জীবনের শব্দে ফিরলাম ভোররাতে। বহুদূর থেকে ভোরবেলার পবিত্র হাওয়ায় আমাদের মা ছেলের কবরের ভিতরে মিহিন সুরে ভেসে এলো ফজরের আজানের শব্দ। সেই শব্দে মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরে এলাম আমরা। মা একটু নড়েচড়ে উঠল। আজানের শব্দ পাছ ধলা?

আমিও একটু নড়ে উঠলাম। হ মা পাই।

তয় তো ফজর হইছে?

হ।

ল তয় অহন বাইর হই।

লও।

মা ছেলে তখন আমরা কবর থেকে বেরিয়ে এলাম। খোলা জায়গায় দাঁড়াবার পর আশ্চর্য এক অনুভূতি হলো আমার। ভোরবেলার হাওয়া, পাখির ডাক আর গাছপালার গন্ধে, পায়ের তলার ঘাস মাটির গন্ধে মনে হলো এই প্রথম পৃথিবীর মাটি হাওয়াতে, ঘাসের বনে আর গাছগাছালির শীতলতায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্যকোনও গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসে যেন পা দিয়েছি আমি। অথবা মৃত্যুর জগৎ থেকে এইমাত্র ফিরেছি জীবনে। সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভিতর মুচড়ে উঠল তীব্র ক্ষুধা। কাল থেকে কিছুই যে খাওয়া হয়নি, কবরের অন্ধকারে একবারও টের পাইনি সেই অনুভূতি। এখন পেলাম।

মাকে বললাম, মা আমি খিদায় মইরা যাইতাছি। যেমনে পারো আমারে কিছু খাওয়াও।

মা বলল, আমি বন্দোবস্স্ত করতাছি। তুই কোনও চিন্স্তা করিস না।

কোরআন শরীফ বুকে নিয়েই বাঁশবাগানের ওদিককার রাস্স্তা দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেল মা। কোথায়

গেল জানি না। আমি বসে রইলাম কাল সারাদিন যেখানটায় বসেছিলাম, বাড়ির আঙিনার ঠিক সেই জায়গাটাতে। আমার তখন মাথা কাজ করছে না। চিন্তা চেতনা অনুভূতি সব লোপ পেয়ে গেছে খিদায়। ট্রেঞ্চে রাত কাটিয়েছি বলে হাত পা মুখ মাথা সব ভরে আছে ধুলোতে। নিজেকে মনে হচ্ছে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা খিদার কষ্টে ধুকতে থাকা মৃতপ্রায় কোনও শেয়াল।

মা ফিরে এলো বেশ তাড়াতাড়ি।

হাতে একটা এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি। হাঁড়িতে কিছু চাল। এসেই কোরআন শরীফটা রাখল রেহালের ওপর। রেহালটা ঠিক সেই আগের জায়গাতেই ছিল।

মা তারপর চাপকলটার কাছে গিয়ে হাঁড়ির চালগুলো ধুঁয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে নিয়ে এলো। আমাদের রান্নাচালার ওদিকটাও ফাঁকা। শুধু মাটির চুলা দুটো আছে। লাকড়ি খড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে। চুলার একপাশে ছোট্ট ন্যাকড়ায় জড়ানো থাকে ম্যাচ। ম্যাচটা সেভাবেই আছে। সেই ম্যাচ জ্বেলে চুলায় আগুন জ্বাললো মা।

এলুমিনিয়ামের হাঁড়িতে টগবগ করে ফুটতে লাগল চাল। জাউ রান্না করল মা। পাতলা জাউ না, থকথকে। থালা বাসন কিচ্ছু নেই। কেমন করে খাবো এই জিনিস?

একটা সময়ে দেখি নিজের অজান্তেই আমি এবং আমার মা মুঠো করে হাঁড়ি থেকে সেই থকথকে জাউ তুলছি আর পাগলের মতো খাচ্ছি। কোনও দিকেই খেয়াল নেই আমাদের।

পেটপুরে জাউ খাওয়ার ফলে শরীরের শক্তিটা আমার ফিরে এসেছিল। মাও বেশ শক্ত সামর্থ্য মহিলা। সারাদিন খেটেখুটে মা আর আমি মিলে আক্কাসের বাড়ি থেকে আনা ছয়টা টিন দিয়ে রোদ বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার মতো একটা চালা মতো করে ফেললাম। বাঁশের খুঁটিখাটি দিয়ে একেবারেই যেনতেন একটা ব্যবস্থা। দুজন মানুষ কোনওরকমে ঘুমাতে পারে এইটুকু মাত্র জায়গা।

আহা রে, কত জৌলুশ একদিন এই বাড়ির ছিল। আর আজ?

চালাটার দিকে যতবার তাকাই, আমার চোখ ভরে আসে জলে। বুকটা হু হু করে। আমাদের বাড়ি লুট করেছিল কেরামতের ভাই আক্কাস। আক্কাসের কথা ভেবে বুকের ভেতর হুঙ্কার ছেড়ে জেগে উঠতে চায় এক ঘুমন্ত সিংহ।

আক্কাস শুয়োরের বাচ্চাকে আমি দেখে নেবো। কোনও না কোনওদিন প্রতিশোধ ওর ওপর আমি নেবোই।

এলাকার তরুণ যুবকরা তখন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া শুরু করেছে। আগে থেকেই যাচ্ছিল। ঈশ্বরগঞ্জে মিলিটারি আসার পর গোপনে গোপনে যাওয়া বেড়ে গেল। আমার বয়সী আমার বন্ধুরাও কেউ কেউ চলে গেল। যারা যায়, তারা কেউ কেউ গোপনে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে। দেখা করে বলে, কী রে ধলা, যাবি? চল যাইগা।

মার সামনেই কেউ কেউ এরকম কথা বলে। মা তাদেরকে বলে, তোরা যা বাজান, ধলা পরে যাইবো।

Munshigonj.com

কেন যে মা আমাকে এভাবে ফিরিয়ে রাখছিল আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সবাই জানে আমাদের বাড়ি লুট হয়ে গেছে। কোনও রকমে তৈরি করা একটা টিনের চালায় মা আর আমি থাকি। ধার উধার করে মা কিছু চাল জোগাড় করে কিছু আনাজপাতি ডাল মাছ জোগাড় করে। ওই খেয়ে কোনও রকমে আমরা বাঁচি। কেরামত আলীর শত্রুতায় এই অবস্থা আমাদের। ভাইকে দিয়ে সে আমাদের বাড়ি লুট করিয়েছে। ওই যে আমার বোনকে পাঁচ নম্বর বউ বানাতে চেয়েছিল। মা রাজি হয়নি দেখে এইভাবে সে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছিল।

কেরামতের কথা ভাবলে আমার কখনও কখনও মনে হয় বাংলাদেশে জন্মে, বাঙালির ঘরে জন্মে, বাঙালি হয়েও কোনও কোনও মানুষ ছিল পাকিস্তানী মিলিটারির নরপশুগুলোর চেয়েও নিকৃষ্ট।

আমার বুকটা তখন ক্রোধে জ্বলে। আমার ইচ্ছে করে মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই। ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র হাতে ফিরে আসি। পাকিস্তানী মিলিটারিগুলোর সঙ্গে গুলি করে মারি কেরামত আর আক্কাসের মতো বাংলাভাষায় কথা বলা নিকৃষ্টতম জীবগুলোকে।

মাকে বলি এইসব কথা। মা আমি মুক্তিযুদ্ধে যাই। মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ফিরে এসে এইসব অনাচারের প্রতিশোধ নিই।

মা বলে সেই এক কথা। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর।

হাসিবুজি তখন পুস্বাইলে, মার সইয়ের বাড়িতে। ছোটবোন রাশেদা ঢাকায় বড় ভাইয়ের কাছে। মেজোভাইয়ের খবর নেই। কোথায় আছে কে জানে! শুনেছি বড় ভাইয়ের একটা ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম রেখেছে মামুন। ভাই ভাবী আর তাদের একমাত্র সন্তান , সঙ্গে আছে রাশেদা, আমার ছোটবোন। কারও কোনও খবর নেই। বেঁচে আছে না মরে গেছে জানি না। শুধু তিনজন মানুষের ব্যাপারে নিশ্চিত। যে হ্যাঁ, এই তিনজন মানুষ আমরা বেঁচে আছি। মা হাসিবুজি আর আমি।

মা আর আমি দুজন অসহায় মানুষ কী যে হতাশা নিয়ে বেঁচে আছি তখন। এই হতাশা সহ্য হয় না। এই হতাশা নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না।

মাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ভোররাতের দিকে একদিন আমি একা একা রওনা দিলাম। মুক্তিযুদ্ধে যাবো। মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ফিরে আসবো।

মোচ্চফা আর আবুল খায়ের আগেই চলে গিয়েছিল। গিয়ে কী যেন কী কারণে আবার ফিরে এসেছে। ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। শুনেছি ফিরে এসেছে কিন্তু কোথায় আছে জানি না।

আমারও শেষপর্যন্ত যাওয়া হলো না। কাঁচামাটিয়া নদী পার হয়ে আটদশ মাইল হেঁটে গিয়েছিলাম। যেতে যেতে মনে হয়েছিল, এ আমি কী করছি? আমার অসহায় মাকে আমি কার কাছে ফেলে যাচ্ছি? আমি চলে গেলে মার আর থাকলো কে?

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে আক্কাস আলীর বাড়ি থেকে পাওয়া

Munshigonj.com

ছয়খানা টিনের নড়বড়ে চালার তলায় কুপি জ্বালিয়ে আমার আশায় বসেছিল মা। বসে বসে কোরআন শরীফ পড়ছিল। ছায়ার মতো নিঃশব্দে মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। কুপির আলোয় দেখি চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মা আমার কোরআন শরীফ পড়ছে।

ঈশ্বরগঞ্জে ঢুকেই মিলিটারিরা ক্যাম্প করেছিল সরকারি ডাকবাংলোয়। আমাদের বাড়ি থেকে বেশ কাছে সেই ডাকবাংলো। দিনেরবেলায় এদিক ওদিক ছাড়িয়ে যায় পাকিচ্চান আর্মি। চারপাশের গ্রাম থেকে ধরে আনে অসহায় নিরীহ মানুষ। হিন্দুপাড়াগুলো খালি হয়েছিল আগেই। একেবারেই দরিদ্র যেসব হিন্দুপরিবার, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই যাদের, সেইসব পরিবারের ছেলে বুড়ো যুবতী বউঝি কিশোরী মেয়ে যাকে পায় ধরে ডাকবাংলোর ক্যাম্পে নিয়ে আসে। পুরম্নষগুলোকে রাইফেল দিয়ে বেদম মারে। বুট দিয়ে এমন এক একটা লাথি, মাটিতে ফেলে বুটের তলায় চেপে ধরে গলা। আহা রে, সেইসব মানুষের প্রাণ ফাটানো চিৎকার। ঝোঁপজঙ্গলে আর বাঁশবনে লুকিয়ে থেকে সেইসব মানুষের মরণ চিৎকার শুনি আমি। রাগে ক্রোধে বুক জ্বলে। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই।

ক্যাম্পের কাছেই আমাদের পাড়াটা বলেই কী না কে জানে, এদিকটায় মিলিটারিরা আসেনি। তাদের ধারণা এইপাড়ার সবগুলি বাড়িই বুঝি ফাঁকা। কোনও বাড়িতেই বুঝি কোনও মানুষ নেই। মানুষ ধরতে তারা চলে যায় অন্যদিককার পাড়ায়, অন্যদিককার গ্রামে। রাতেরবেলা গভীর অন্ধকারে মায়ের পাশে শুয়ে থেকে থেকে নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনতে পাই। ডাকবাংলো থেকে ভেসে আসে সেই চিৎকার। ওই যে রামগোপালপুর জমিদার বাড়ির কাছে একবার গিয়েছিলাম তবলার আওয়াজ আর নারীকণ্ঠের চিৎকার শোনার জন্য। এই চিৎকারও সেই চিৎকারের মতোই। যন্ত্রণায় যেন জীবনের শেষ চিৎকারটি দিচ্ছে কোনও নারী। বাবা বাবা, তুমি আমার বাবা। ছাইড়া দাও আমারে, ছাইড়া দাও।

বুঝতে পারি, ভয়ঙ্কর ভাবে চলছে নির্যাতন। ধর্ষণ। হয়তো বা পালাক্রমে চলছে। আফ্রিকার বন্যকুকুরের দল যেভাবে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ধরে নিরীহ হরিণ, চারদিক থেকে খাবলে খুবলে ছিঁড়তে থাকে তার মাংস, এযেন ঠিক সেই রকম এক কাজ। মানুষ হয়ে মানুষের ওপরই এরকম নির্যাতন চালাচ্ছে মানুষের মতো দেখতে একশ্রেণীর বন্যকুকুর।

ক্যাম্পের আশেপাশে কোনও লাশ চোখে পড়তো না। মেরে লাশগুলো ওরা ফেলে দিয়ে আসতো দূরের বিল বাওড় কিংবা ডোবা নালায়।

আমাদের পাড়াটা বাস্ত্মবিকই সুনসান হয়ে গেছে, নির্জন হয়ে গেছে। লোকজন বলতে গেলে নেই। আছে ওই শালারপুত আক্কাস। বউবেটি নিয়েই আছে। ওর সঙ্গে কেমন কেমন করে ভাব হয়েছে পাকিস্ত্মান আর্মির। যে বেটা ক্যাপ্টেন, ঈশ্বরগঞ্জ থানার দায়িত্বে, ওই পুঙ্গিরপুতের সঙ্গে খাতির জমিয়েছে আক্কাস। আক্কাসের মতো এলাকার আরও দুচারজন রাজাকারের খাতায় নাম লিখিয়েছে। ততোদিনে সারা দেশেই পাকিস্ত্মানের পক্ষোর লোকগুলো রাজাকার হতে শুরম্ন করেছে। শান্তিবাহিনীর সদস্য হতে শুরম্ন করেছে।

এসব দেখে মা গেল ভয় পেয়ে।

পাড়ায় একমাত্র যুবক ছেলে আমি। আক্কাস যদি এই কথা মিলিটারিদের জানিয়ে দেয় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এর আগে থানা কম্পাউন্ডে, স্কুলের মাঠে মুক্তিযোদ্ধার প্রাথমিক একটা ট্রেনিংও নিয়েছিলাম আমি। আক্কাস এসব জানে।

Munshigonj.com

মা আমাকে বলল, তুই সইরা যা ধলা। আমার যা হওনের হইব তুই তোর জান বাঁচা।

আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার অভাবটা তখন আর নেই। মার সইয়ের বাড়ি থেকে বিরাট একবচ্চা চাল, বেশ কয়েক সের ডাল, আনাজপাতি তরিতরকারি চারজন লোক এসে দিয়ে গেছে। যা দিয়ে গেছে দুজন মানুষের সেই খাবারে তিন চারমাস চলবে।

এদিক দিয়ে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত।

মা অন্তত না খেয়ে মরবে না। তাও মাকে বললাম, বেশি অসুবিধা দেখলে তুমি পুস্বাইলে চইলা যাইও। মাউই মার বাড়িতে গিয়া থাইকো। ওই বাড়িতে থাকলে ভালো থাকবা তুমি। তোমার সই তো আছেই, হাসিবুজিও আছে। আর ওইদিকে তো মিলিটারি যাওনের প্রশ্নই ওঠে না। তুমি পুস্বাইলে চইলা যাইও।

মা বলল, কইলাম না আমারে লইয়া তুই চিন্তা করিস না। তুই তাড়াতাড়ি সইরা যা।

পরনে সেই ছেঁড়া খয়রি প্যান্ট আর স্যান্ডোগেঞ্জি। আমি পথে নামলাম।

স্টেশনের ওদিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে। ওই রাচ্চা দিয়ে কয়েক মাইল গেলে ঢুফির বাজার। 'ঢুফি' শব্দটার অর্থ হলো ঘুঘু। ঘুঘু পাখি। ঢুফির বাজার মানে ঘুঘুর বাজার। ওই দিকটায় শোনলাম মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প হয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুক্তিযোদ্ধারা। ততোদিনে দেশের এদিক ওদিক যুদ্ধ শুরু করেছে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা। সামনাসামনি যুদ্ধ করছে, গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করছে। টাঙ্গাইলের ওদিকে কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনী পাকিস্তানী মিলিটারি মেরে সাফা করে ফেলছে। গোপনে গোপনে যারা স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র শোনে তাদের কাছ থেকে এইসব খবর পাই।

ঈশ্বরগঞ্জ ডাকবাংলোর ক্যাম্পে দশ পনেরোটা আর্মির গাড়ি। প্রায়ই এই গাড়িগুলো ভরে মিলিটারিরা যায় হালুয়াঘাটের দিকে। কাদেরিয়া বাহিনী হালুয়াঘাটের ওইদিক নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকা থেকে নাকি পাকিস্তান আর্মি যাচ্ছে কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কিন্তু যুদ্ধে পাকিস্তানীরা একদমই সুবিধা করতে পারছে না। কাদেরিয়া বাহিনীর হাতে বেধরক মরছে।

ঈশ্বরগঞ্জের ওই পুঙ্গিরপুত ক্যাপ্টেন কেরামত আলী আব্বাস আলীর মতো নেড়িকুত্তাগুলোকে ডেকে বলেছে, আমাদের অনেক রাজাকার দরকার। যে বাড়িতে চারজন পুরুষ আছে, সেই বাড়ির দুজনকে অবশ্যই রাজাকার হতে হবে। যারা হতে চাইবে না তাদেরকে গুলি করে মারবো।

পাকিস্তানের প্রেমে গদগদ হয়ে স্বেচ্ছায় রাজাকার হয়েছিল অনেকেই। আবার কেউ কেউ হয়েছিল প্রাণের ভয়ে, বাঁচার তাগিদে। ভিতরে ভিতরে তারা স্বাধীনতার পক্ষের মানুষ। ওপরে ওপরে রাজাকার। এই শ্রেণীর রাজাকাররা অনেক রকমভাবে আমাদের অনেক উপকার করেছে। আমি তাদেরকে রাজাকার মনে করি না। মনে করি তারাও আসলে মুক্তিযোদ্ধা। জীবন বাঁচাবার জন্য ওপরে ওপরে তারা রাজাকার, ভিতরে ভিতরে তারা মুক্তিযোদ্ধা।

Murshidganj.com

এলাকার কিছু স্বচ্ছল হিন্দুও রয়ে গিয়েছিল। আক্কাসরা সেইসব হিন্দুদেরকে খুঁজে বের করেছে। মিলিটারিদের কাছে তাদের হদিস দিয়েছে। মিলিটারিরা গিয়ে ধরে এনেছে। ধরে এনে প্রথমেই কিন্তু মেরে ফেলেনি। আক্কাসরা কেউ কেউ ততোদিনে বেশ ভালো উর্দু শিখে গেছে। মিলিটারিরা তাদের মাধ্যমে প্রস্তাব দিয়েছে, হিন্দুগুলোকে বলো ওরা যদি পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, ওরা যদি মুসলমান হয়, তাহলে প্রাণে বেঁচে যাবে। ওদেরকে আমরা মারবো না।

রাইফেলের নলের মুখে, প্রাণের ভয়ে রাজি হয়ে গেছে সবাই। মসজিদের ইমাম সাহেবকে আগেই এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে ক্যাম্পে। তিনি নিয়ম মতো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন অসহায় হিন্দুদেরকে।

কিন্তু মুসলমান হতে চেয়েও বাঁচতে পারলেন না আমাদের চূর্নিখোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার, হরিদাস ভট্টাচার্য আমার বন্ধু রন্নুর বাবা। রাতেরবেলা তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে ক্যাম্পে। খবর পেয়ে রন্নুর বড়ভাই বেনু ছুটে গেছে। তাকেও আটক করেছে মিলিটারিরা। দুজনেই রাজি হয়ে গেছে মুসলমান হতে। বলেছে, পরিবারের অন্যান্যদেরকেও মুসলমান করে ফেলবে তারা। কেরামত আর আক্কাস দুইভাই ছিল সামনে। মিলিটারিদেরকে তারা বলল, হেডমাস্টার লোক ভালো না। যতই মৌলবি ডেকে তাকে মুসলমান করা হোক, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই সে ধর্মটা মানবে না, পরিবার নিয়ে রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে যাবে।

তাদের কথা শুনে আমার সেই প্রিয় স্যার আর তার বড়ছেলেকে, আমার প্রিয়বন্ধু রন্নুর বাবা আর তার বড়ভাইকে কেরামত আর আক্কাসের চোখের সামনে গুলি করে মারলো মিলিটারিরা। সেই মৃত্যু দৃশ্য থেকে হায়েনার মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছিল কেরামত আর আক্কাস।

হেডমাস্টার স্যার আর তার বড়ছেলেকে আক্কাসরা এইভাবে হত্যা করিয়েছিল পুরনো একটা ক্রোধ মিটাবার জন্য। ঈশ্বরগঞ্জে রন্নুদের ছিল অঢেল জায়গা সম্পত্তি। কেরামত লোভী চেয়ারম্যান। রন্নুদের জায়গা সম্পত্তি বেশ কিছু সে দখল করেছিল। ওসব নিয়ে স্যারের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমাও চলছিল। মামলায় জিততে পারছিল না কেরামত। অন্যদিকে আরও জমি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় তো স্যারকে খুন করা যায় না। কারণ স্যার খুবই জনপ্রিয় মানুষ। তাকে খুন করালে খুবই বিপদে পড়বে কেরামত। এইজন্য মিলিটারিদের মাধ্যমে পথের কাঁটা সরিয়ে দিল।

আমার সঙ্গে তখন একটা পয়সাও নেই।

সকালবেলা স্টেশনের ওদিক দিয়ে রওনা দিয়েছি। তার আগে আক্কাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আক্কাসের বাড়ি আমাদের বাড়ির সঙ্গেই তো। সকালবেলা আমি গোসল করেছি। গামছা পরে গোসল করে ওই ছেঁড়াপ্যান্ট গেঞ্জি পরেছি। তারপর চুপচাপ পথে নেমেছি। আক্কাস কিছু বুঝতেই পারেনি।

ঢুফির বাজার জায়গাটা ঈশ্বরগঞ্জ থেকে বেশ অনেকটা দূরে। জোতখোলা বিল বাওড়ের ভেতর দিয়ে, গ্রামের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। আমি হাঁটছি, হাঁটছি। ঢুফির বাজারে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল।

ঢুফির বাজারে গিয়ে দেখি এ যেন একেবারেই অন্যরকমের একদেশ। মানুষের কোনও চিন্তা টেনশান কিচ্ছু

Munshigonj.com

নেই। বাজার করছে, খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছে। কোনও ভাবনাই নেই কারন্নর। দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, পাকিচ্চানীরা যে মানুষ মেরে শেষ করে ফেলছে এসব নিয়ে যেন মাথা ব্যথা নেই। একেবারেই স্বাভাবিক অবস্থা চারদিকে।

আমি অবাক।

এ কোন দেশে এলাম?

কোথায় আমাদের শ্বাসরন্নদ্ধকর ঈশ্বরগঞ্জ, আর কোথায় এই ঢুফির বাজার? হাতেরম মুঠোয় প্রাণ নিয়ে ঢুকতে হয় ঈশ্বরগঞ্জে। এই বুঝি রাজাকাররা ধরে নিয়ে গেল মিলিটারি ক্যাম্পে, এই বুঝি ক্যাম্পের পিছনে নিয়ে কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে দাঁড় করালো, এই বুঝি গুলি করে দিল বুকে।

আর ঢুফির বাজার?

ঢুফির বাজার যেন আমরা যে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, সেই স্বাধীন এক টুকরো বাংলাদেশ।

আমার মন ভালো হয়ে গেল।

বুক ভরে গেল উচ্ছ্বাস আনন্দে।

বাজারের দিকে যাচ্ছে এমন একজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, এখানে মুক্তিবাহিনী কোথায় থাকে?

লোকটা সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকালো। কেন?

এখানকার মুক্তিবাহিনীতে আমার এক আত্মীয় আছে। আমি একটু তার লগে দেখা করন্নম।

তোমার আত্মীয়র নাম কী?

ঈশ্বগঞ্জের আব্দুল জব্বার আমার চে' দুবছরের বড়। কিন্তু আমার তুই তুকারি বন্ধু। শুনেছি আগরতলা থেকে সে মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। ঢুফির বাজারের এই দিকেই আছে।

আব্দুল জব্বারের নামই আমি সেই লোকটাকে বললাম।

আব্দুল জব্বার নামটা শুনে লোকটা বেশ চঞ্চল হলো। দূরের একটা বটগাছ দেখিয়ে বলল, ওই বটগাছের ওদিক দিয়া যাও। গেলেই দেখবা বাঁশঝাড়ওয়ালা একটা বড়বাড়ি, ওই বাড়িতেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প।

দ্রন্নত হেঁটে সেই বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার বয়সী, আমার চে' বড় এরকম তিরিশ চলিস্নশজন যুবক। অনেকেই আমার চেনা, অনেকেই ঈশ্বরগঞ্জের ছেলে। আব্দুল জব্বারকে পেলাম প্রথমেই। সঙ্গে আছে সাত্তার। আমাকে দেখে হইচই পড়ে গেল বাড়িতে।

Munshigonj.com

জব্বার বলল, তুই আইছস ক্যান?

আমিও মুক্তিবাহিনীতে যামু। আমিও ট্রেনিং লমু।

সাত্তার বলল, তোর ট্রেনিং লওনের কাম নাই, তুই যা গা।

না আমি যামুই। তোরা আমার যাওনের ব্যবস্থা কর।

জব্বার বলল, সবাই গেলে তো হইব না। সবাই মরলে তো চলবো না। তোর যাওনের কাম নাই।

জব্বারের পরনে হাফপ্যান্ট, কোমরে মোটা বেল্ট। তার ওপর হাফহাতা শার্ট। মাথার চুল লম্বা লম্বা। মুখ দাড়িগোঁফে ভরা। চোখ দুটো টকটকে লাল। জব্বারের কাঁধে ঝুলছে স্টেনগান। গলার আওয়াজ কেমন মোটা ফ্যাফ্যাসে হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নানারকম অর্ডার দিচ্ছে।

সাত্তার বলল, তুই মনে হয় বোঝস নাই ধলা। জব্বার হইল আমগ কমান্ডার।

আমি জব্বারের মুখের দিকে তাকালাম। তুই আমারে না করিস না দোস্ত। আমারে ট্রেনিংয়ে পাঠা।

জব্বার ঠাণ্ডা গলায় বলল, থাক এইখানে, পরে বুঝুম নে।

আমি থেকে গেলাম।

একজন মধ্যবয়সী মহিলা রান্নাবান্না করতো ক্যাম্পে। দুপুরবেলা খেলাম সেই মহিলার রান্না ভাত একপদের মাছ আর ডাল। রাতেরবেলা খাসির মাংস আর ভাত। বিকেলবেলা কারা যেন একটা খাসি দিয়ে গিয়েছিল। সেই খাসি জবাই করে রাতেরবেলা বিরাট খাওয়া দাওয়া। খাসির মাংসের বড় বড় টুকরা আর তেলতেলে ঝোল, কী যে আরাম করে খেলাম। মনে হলো বহুদিন পর পেটভরে খাচ্ছি।

খাওয়ার দাওয়ার পর আলাদা করে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল জব্বার। বলল, তোর আগরতলা যাওনের কাম নাই। তোর ট্রেনিং নেওনের দরকার নাই। সবার ট্রেনিং লাগে না। তুই অন্যকাম কর।

কী কাম?

এলাকায় আর্মি আইছে না?

হ আইছে।

তোর কাম হইল ঈশ্বরগঞ্জ ডাকবাংলোর ক্যাম্প থিকা আর্মি কই যায় না যায়, এই খবর রাখন। রাজাকাররা কী করে না করে, এই খবর রাখন। সব খবর লইয়া তুই এই ক্যাম্পে আইসা আমারে জানাইয়া যাবি। তয় কামডা করতে হইব খুব সাবধানে। এইটাও কিন্তু মুক্তিবাহিনীরই কাম। এই কাম করলে তুই মুক্তিযোদ্ধা

Munshigonj.com

হইয়া যাবি। এইটা তোর ডিউটি। কাইল সকালেই তুই ঈশ্বরগঞ্জ চইলা যা। কাম শুরু কর।

ঢুফির বাজার ক্যাম্প থেকে আমার বন্ধু কমান্ডার জব্বারের আদেশ পালন করতে অন্যরকমের এক মুক্তিযোদ্ধা হয়ে আমি ঈশ্বরগঞ্জে ফিরে এলাম। জব্বার যেভাবে বলেছিল সেইভাবে কাজ শুরু করলাম।

ডাকবাংলোর অদূরে বিশাল এক মাঠ।

সেই মাঠে গরু চড়ায় এলাকার হতদরিদ্র কৃষকরা। এই শ্রেণীর মানুষকে মিলিটারিরাও কিছু বলে না, রাজাকাররাও কিছু বলে না। আমি গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম। ছেঁড়া একটা লুঙ্গি জোগাড় করেছি, গামছা এবং মাথলা জোগাড় করেছি। জুন জুলাই মাসের রোদে পুড়ে যাচ্ছে দেশ, খোলামাঠ ঝাঁ ঝাঁ করে রোদে। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু করে ছেঁড়া লুঙ্গি পরি। কোমরের কাছে বাঁধি পুরনো গামছা, মাথায় মাথলা দিয়ে হতদরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে মিশে ওদের গুরুগুলো চড়াই। আমাকে পেয়ে কেউ কেউ তাদের গরু আমার জিম্মায় দিয়ে অন্যান্য কাজে চলে যায়। আমি গরু চড়াবার ফাঁকে ফাঁকে ডাকবাংলোর আর্মি ক্যাম্পের দিকে চোখ রাখি। তারা কী করে, কাকে ধরে আনে, কাকে মারে সব দেখে রাখি।

কখনও কখনও রাখালের সাজেই বাজারের দিকে যাই। বাজারের চারদিকে গিজগিজ করে রাজাকার। প্রত্যেকের কাঁধে থ্রি নট থ্রি রাইফেল। প্রত্যেকেই নিয়েছে রাজাকারি ট্রেনিং। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেকেই রাজাকার না। ওই যে বলেছি জীবন বাঁচাবার জন্য রাজাকার হয়েছে কেউ কেউ। ওই শ্রেণীর রাজাকাররা সত্যিকার অর্থেই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। কারণ তারা নানারকম ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছিল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে।

প্রথম দিন আমাকে রাখালের চেহারায় দেখে ওরকম দুজন রাজাকার জিজ্ঞেস করলো, কী রে ধলা, খবর কী?

আমি শুকনো গলায় বললাম, কোন রকমে মারে লইয়া বাঁইচা আছি ভাই। তোমগ এইদিককার খবর কী?

এইরকম টুকটাক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আগাতে চাচ্ছি। রাজাকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ওইসব মুক্তিযোদ্ধা বুঝে যায়, আমি আসলে কী জানতে চাই, আমি আসলে কাদের হয়ে কাজ করছি?

ওরা আমাকে খবর দিতে শুরু করে। কাইল সকালে দুই গাড়ি আর্মি যাইবো হালুয়াঘাটে।

পরদিন ভোররাতে ওঠে আমি দৌড়ে যাই ঢুফির বাজার ক্যাম্পে। জব্বারকে দিয়ে আসি যতটুকু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি। দৌড়ে দৌড়ে যাই, দৌড়ে দৌড়ে আসি। তারপরও ফিরতে দুপুর পেরিয়ে যায়।

যেসব রাজাকার ভিতরে ভিতরে মুক্তিযোদ্ধা, তাদের উদ্দেশ্য একটাই, কাঁধের অস্ত্রটি আর যতগুলো সম্ভব গুলি নিয়ে ওরা একদিন উধাও হয়ে যাবে। সম্ভব হলে আর্মি ক্যাম্প থেকে অস্ত্র চুরি করে উধাও হয়ে যাবে। রাজাকার হিসাবে অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং তো ওদের আছেই।

এরমধ্যে জনা পঁচিশেক অস্ত্র আর গুলি নিয়ে উধাও হয়েছে। সরাসরি চলে গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে। যারা এভাবে পালিয়েছে, তারা নিজেরা বেঁচেছে ঠিকই কিন্তু তাদের ফ্যামিলি বাঁচেনি। তাদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে আর্মি। মা বাপ ভাইবোন আত্মীয় স্বজন যাকে যাকে পেয়েছে ধরে নিয়ে এসেছে। টর্চারে টর্চারে মেরে

Munshigonj.com

ফেলেছে। অস্ত্র নিয়ে কোথায় পালিয়েছে তাদের বাড়ির ছেলে, সেইসব খবরও বের করে ফেলেছে। কিন্তু ধরতে পারেনি একজনও মুক্তিযোদ্ধাকে।

আসল রাজাকারগুলো বাজারে আমাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই ওদের মতো রাজাকারিতে নাম লেখতে বলতো। ট্রেনিংটা লইয়া ল ধলা। অস্ত্র পাবি, খাওন দাওন টেকা পয়সা পাবি, অসুবিধা কী?

আমি কাতর গলায় বলি, আমার মা বুড়ো মানুষ তারে নিয়া বড় বিপদে আছি। মার দেখভাল করতে হয়। রান্নাবান্না কইরা খাওয়াইতে হয়। বাড়ি লুট হয়ে গেছে, থাকি খোলা আসমানের তলায়। এই অবস্থায় মারে বাঁচাইয়া রাখন আমার বড় কর্তব্য।

ওইসব রাজাকার জানে মা আর আমি ছাড়া আমার ভাইবোন আর কেউ বেঁচে নেই। সব মারা গেছে। ওদের বুঝি একটু মায়াও লাগতো আমার জন্য। আমাকে আর কিছু বলতো না।

শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান হয়েছে ওসমান গনি। এলাকায় ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। বিদ্বান লোক, বুদ্ধিমান লোক। হঠাৎ করে সে গেছে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে। এত ভালো লোক কিন্তু শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটা তার বদলে গেল। এমন অত্যাচার শুরু করলো লোকজনের ওপর। তার দোসর হিসেবে আছে সেই কেরামত আলী চেয়ারম্যান। ওই শুয়োরের বাচ্চা আবার একটা ভালো পথ ধরেছে, মিলিটারি আর রাজাকারদের সঙ্গেও খাতির , মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেও খাতির। দুই দলকেই হাতে রাখে। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে টাকা পাঠায়, চাল ডাল ওষুধ পাঠায়। কেরামত আলীর এই কায়দা আবার ওসমান গনি টের পায় না। হাতে ক্ষমতা পেয়ে ওসমান গনি গেছে পাগল হয়ে। পাকিস্তানী মিলিটারিদের চেয়েও বেশি নৃশংস হয়ে উঠেছে সে। যাকে খুশি তাকে ধরে নিয়ে আসে। দিন দুপুরে গুলি করে মারে। মেয়েদেরকে ধরে এনে দিন দুপুরে অত্যাচার চালায়। কোনও কোনও লোককে ধরে এনে তার চেহারার দিকেও তাকায় না, চামচাগুলোকে অর্ডার দেয়, মাইরা ফালা।

হিন্দু হোক মুসলামান হোক, অবিরাম মানুষ মারতে শুরু করলো ওসমান গনি। কোন জনমে কার সঙ্গে তার বিরোধ ছিল সেইসব বিরোধের প্রতিশোধ নিতে লাগলো। অন্যদিকে রাজাকাররা চালাচ্ছে লুটপাট। ওসমান গনি যেহেতু শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান, তার আদেশে চলতো রাজাকাররা। লুটপাট করে বড়লোক হয়ে গেল লোকটা। আগেই বলেছি শিক্ষিত মানুষ। উর্দু খুব ভালো বলে। আর্মিদের সঙ্গে গড় গড় করে কথা বলে। উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে নিজের ফায়দা লুটে।

আমার মাকে খুবই শ্রদ্ধা করতো ওসমান গনি। ভাবী ডাকতো।

একদিন বাজারের দিকে যাচ্ছি, দশ পনেরোজন রাজাকার নিয়ে বাজারে চক্কর দিচ্ছে ওসমান গনি। হাত ইশারায় আমাকে ডাকলো, এইদিকে আয়।

ভয়ে বুকটা ধ্বক করে উঠল আমার। ঢোক গিলে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আসলামালায়কুম চাচা।

সে আমার সালামের জবাব দিল না। কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কই যাস?

বাজারে যাই চাচা, বাজারে।

Murshidganj.com

বাজারে যাইতাছস ক্যান? খালি ভেগাবণ্ডের মতন ঘুইরা বেড়াও ক্যান? রাজাকারি ট্রেনিংটা লইতে পারো না?

ভয়ে ভয়ে বললাম, ট্রেনিং কেমনে লমু? আমার তো কেউ নাই চাচা?

নাই মানে?

মা আর আমি ছাড়া তো কেউ নাই। বেবাকতে মইরা গেছে।

হ। ওইডা আমি জানি।

অহন মার অবস্থাও খুব খারাপ। যখন তখন মইরা যাইবো। আমি বাজার বোজার কইরা মারে খাওয়াই। বাড়ির পাকশাক বেবাকই আমার করতে হয়।

কস কী তুই?

হ চাচা।

ওসমান গনি একটু চিন্তিত হলো। তোর মার অসুখ? কেউ নাই? আইচ্ছা তুই যা। মার সেবাযত্ন কর গিয়া।

সঙ্গের রাজাকারদের বলল, ওরে কেউ কিছু কইয়ো না। বুড়া মা ছাড়া ওর অহন আর কেউ নাই। ভাইবোন বেবাক মইরা গেছে।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বাজারে না গিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। মাকে বললাম ওসমান গনির কথা।

পরদিন গেলাম ঢুফির বাজার। ক্যাম্পে গিয়ে জব্বারকে বললাম ওসমান গনির কথা। তার অত্যাচার এবং মানুষ মারার কথা।

জব্বার চুপচাপ সব শুনে রাখল।

ঈশ্বরগঞ্জ ক্যাম্পে কিছু মিলিশিয়াও আসছে। কালো সালোয়ার কামিজ পরা। ভয়ঙ্কর দেখতে এক একটা। রাজাকারদের নিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াই তারা। গরিব দুঃখী গৃহস্থলোকেরা টুকটাক জিনিসপত্র নিয়ে আসে বাজারে, সেইসব জিনিসের যেটা যেটা পছন্দ হয় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেয়। কেউ কোনও প্রতিবাদ করতে পারে না। করলেই ধাম করে কোঁকসা বরাবর বুটপরা পায়ের লাথি। কখনও কখনও রাইফেলের বাট দিয়ে বারি। মুদিদোকান থেকে তেলের টিন নিয়ে যাচ্ছে, একজন গৃহস্থ হয়তো দুটো মুরগি এনেছে বিক্রি করতে, ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাঠ থেকে ধরে নিয়ে আসছে গরম্ন ছাগল। জবাই করে খাচ্ছে ক্যাম্পে বসে। শুয়োরের বাচ্চাদের আনন্দ উলস্নাসের সীমা নেই। কিন্তু এলাকার লোক নিঃস্ব হয়ে গেছে। অনেকের বাড়িতেই খাবার নেই।

ওসমান গনিকে একদিন দেখলাম, জঘন্য ব্যবহার করলো এক গৃহস্থের সঙ্গে। লোকটা বুড়ো মতন, মুখে

Munshigonj.com

পাঁকা দাড়ি। একজোড়া মুরগি বিক্রি করতে এনেছে বাজারে। ওসমান গনির চোখে পড়ল সেই মুরগি। একজন রাজাকারকে বলল, বুইড়ার কাছ থিকা ওই দুইটা লইয়া আমার বাড়িতে দিয়া আয়।

লোকটা কাতর গলায় বলল, বাবারে, আমার ঘরে কয়েকদিন ধইরা খাওন নাই। ঘরে বেচনের মতন কোনও জিনিসও নাই। খালি এই মুরগি দুইটা আছিল, এই দুইটা বেইচা চাইল ডাইল লইয়া বাড়িত যামু। বউ পোলাপাইনরে খায়ামু।

লোকটাকে বিরাট ধমক দিল ওসমান গনি। কথা কইস না নডিরপুত। গুলিস্ন কইরা দিমু।

লোকটা ওসমান গনির সঙ্গে একটু তর্ক করেছিল। আপনের মতন মানুষ এমন করলে আমরা যামু কই, কার কাছে যামু?

ওসমান গনি আর কথা বলল না। একজন রাজাকারকে কী ইশারা করল, দুতিন মিনিটের মধ্যে ক্যাম্প থেকে একদল মিলিশিয়া এলো, এসে প্রথমে লোকটার দাড়ি ধরে দুতিনটা হেঁচকা টান দিল। তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বাজারের মাটিতে। লোকটার চোখ দিয়ে তখন পানি পড়ছে। শব্দ করে কাঁদছে না সে, কাঁদছে নিঃশব্দে। মুরগি নিয়ে ওসমান গনির দল চলে গেছে। বাজারের মাটি থেকে গামছাটা কুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সেই লোক। গামছায় চোখ মুছতে মুছতে হাঁটতে লাগল।

আমি তখন ভয়ে ভয়ে থাকি, পালিয়ে পালিয়ে থাকি। যখন যেটুকু খবর পাই, জব্বারকে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি।

এই খবরও দিয়ে এলাম।

বাপ এবং ভাইকে মেরে ফেলার পর রম্ননুদের ফ্যামিলিটা তছনছ হয়ে গেছে। কে কোথায় চলে গেছে কিছুই জানি না আমি। এদিকে মিলিটারিরা কেমন যেন একটু বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে। দেশের সর্বত্র চলছে প্রচণ্ড যুদ্ধ। ঈশ্বরগঞ্জ ডাকবাংলোর ক্যাম্পে মিলিটারিদেরকে খুবই অস্থির দেখি। প্রথম প্রথম যে ভয় গ্রামের মানুষের ছিল তা যেন বেশ কিছুটা কমে এসেছে। রাতভর টহল দেয় আর্মি। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। উড়ো খবর পেয়ে কোথাও কোথাও ছুটে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধানে। সঙ্গে রাজাকার আর শান্তিবাহিনীর লোক। গভীর রাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে কোনও বাড়িতে। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে টুকটাক যুদ্ধ হচ্ছেই। কোনও বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা আছে বা আশ্রয় নিয়েছে শুনলেই কোনও কিছু না ভেবে সেই বাড়ি ঘেরাও করে গোলাগুলি শুরম্ন করে মিলিটারিরা। তারপর আগুন জ্বালিয়ে দেয় সেই বাড়িতে।

জব্বারদের ক্যাম্পেও দেখি এক ধরনের অস্থিরতা। দল বেঁধে একেক দিকে যাচ্ছে তারা। মিলিটারি যাতে অনায়াসে সর্বত্র যাতায়াত করতে না পারে সেইজন্য ছোটখাটো পুল ব্রিজ সব উড়িয়ে দিচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা। রামগোপালপুরের ব্রিজটা উড়ালো ডিনামাইট দিয়ে। এই ব্রিজটা ছিল বহু পুরনো। গৌরিপুরের ব্রিজটা উড়ালো, সেটাও পুরনো ব্রিজ। শুধু ময়মনসিংহের ব্রিজটা উড়াতে পারলো না। রামগোপালপুর আর গৌরিপুরের ব্রিজ ধ্বংস হয়ে গেছে শুনে ময়মনসিংহের ব্রিজের দুপাশে প্রচুর আর্মি ছিল পাহারায়। মুক্তিযোদ্ধারা ওদিকটাতে যেতে পারেনি।

একেকদিক মুক্ত করে মুক্তিযোদ্ধারা তখন আগাচ্ছে। জব্বাররা পস্ন্যান করেছে এবার তারা ধীরে ধীরে

Munshigonj.com

ঈশ্বরগঞ্জের দিকে আগাবে। কীভাবে ঈশ্বরগঞ্জ ক্যাম্প আক্রমণ করবে তার পরিকল্পনা চলছে।

এসময় একদিন রন্নু এসে হাজির ঢুফির বাজার ক্যাম্পে। উদ্ভ্রান্তের মতো চেহারা। আমাদের সেই রাজপুত্রের মতো রন্নু আর নেই। মাথার চুল কাকের বাসার মতো, চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, চেহারা ভাঙাচোরা। সুন্দর মুখটা ভরে গেছে দাড়িগোঁফে। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে।

আমি সেদিন জব্বারদের ক্যাম্পে।

রন্নুকে দেখে হইচই পড়ে গেল ক্যাম্পে।

জব্বার বলল, কী রে রন্নু, তুই আছিলি কই?

রন্নু উদাস গলায় বলল, মিলিটারি ক্যাম্পে।

কী?

হ। আমি ধরা পইড়া গেছিলাম। বাবারে আর দাদারে মাইরা ফালানের পর আমরা সবাই পলাইতেছিলাম। বাড়ির সবাই পলাইতে পারছে আমি পারি নাই। আমি ধরা পইড়া গেছি।

জব্বার হলো কমান্ডার। সে কথা বলবার সময় অন্যকেউ কথা বলে না। তারপরও সাহস করে রন্নুকে আমি জিজ্ঞাস করলাম, তোরে টর্চার করছে?

রন্নু বলল, বহুত টর্চার করছে।

জব্বার বলল, কীভাবে টর্চার করছে?

যত রকমভাবে করা যায়। মারতে মারতে আমার হাড্ডিগুড্ডি ভাইঙ্গা দিছে। বহুত ম্যান্টাল টর্চার করছে। দেখস না আমার কথাবার্তার ঠিক নাই।

সত্যি রন্নু কেমন যেন একটু অ্যাবনরমাল। রন্নুর জন্য যে আমার কী খারাপ লাগলো।

জব্বার বলল, মিলিটারির হাত থেকে তুই বাঁইচা আইলি কেমনে?

জামিনে আইছি।

কে তোর জামিন হইছে?

হইছে একটা লোক, তোরা চিনবি না।

কেমনে সে তোর জামিন হইলো?

Munshigonj.com

আর্মির লগে তার খুব খাতির। আমারে দেইখা তার মায়া লাগছে। আমি তার হাতেপায়ে ধইরা কইছি, আপনে আমার জামিন হন, পাঁচটা দিনের লেইগা আমারে ছাড়ান। আমি হিন্দুর পোলা, এক জবানের মানুষ। ঠিক পাঁচদিন পর আপনার কাছে ফিরত আসুম। এই পাঁচদিনে আমি আমার মা ভাইবোনরে খুঁইজা বাইর করমু। খালি একটু জানতে চাই, তারা বাঁইচা আছে কি না।

আমি বললাম, লোকটা তোরে বিশ্বাস করলো? রাজি হইল তোর কথায়?

হ হইল।

জব্বার বলল, তুই এইসব বলার পর মিলিটারিগ হাত থিকা তোরে ছাড়াইলো কেমনে?

মিলিটারিগ গিয়া সে কইলো, ও খুব ভালো পোলা, আমি ওর জামিন হইলাম। ও পাঁচদিন পর ফিরত আইবো। না আইলে আমারে গুলিস্ন কইরা মাইরেন।

এই রকম ঘটনা কী ঘটে?

নিজের জীবনের বিনিময়ে অচেনা একটি ছেলেকে কি কেউ এইভাবে ছাড়ায়?

আমরা কেউ কিন্তু ঘটনাটা বিশ্বাস করলাম না। জব্বার আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, রমনুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আর্মির টর্চারে ওর সব কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। তোর তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুই ওরে আড়ালে ডাইকা নিয়া ভালো কইরা সব জাননের চেষ্টা কর।

আমি রমনুকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলাম। রমনু, কই ধরা পড়ছিলি তুই?

রমনু উদাস গলায় বলল, কংশনদী পার হওনের সময়।

আর্মিরা তোরে কই ধইরা লইয়া গেছিল?

কংশনদীর ওইপারের ক্যাম্পে।

অহন তুই কী করবি?

ওই ক্যাম্পে ফিরত যামু।

কচ কী?

হ। যেই লোকটা আমার জামিন হইছে, আমি না গেলে তো সে ছাড়া পাইবো না। তারে তো মিলিটারিরা গুলিস্ন কইরা মারবো।

Munshigonj.com

আরে বেডা, ওরে লইয়া তুই চিন্তা করছ ক্যান? তারে মিলিটারিরা গুলি কইরা মারুক, নাইলে ছাইড়া দেউক, ওইডা তো তোর ব্যাপার না। তুই তোর জান বাঁচা! ওই ক্যাম্পে ফিরত গেলে মিলিটারিরা তো বেডা তোরে গুলি কইরা মারবো।

রুনু অপলক চোখে আমার মুখের দিকে তাকালো। তুই এইডা কী কইলি ধলা? আমি আমার মা ভাইবোনরে দেখনের লেইগা পাগল হইয়া গেছিলাম। আমার অনুরোধে অচেনা একটা লোক আমার জামিন হইছে। তুই একবার ভাইবা দেখ তো কতবড় আত্মার মানুষ সে। আমার জন্য জীবনের রিস্ক নিছে। আর আমি তার লগে বেঈমানি করুম? নিজের জীবন বাঁচানের লেইগা জামিনদাররে মাইরা ফালামু। এইডা হয় না দোস্ত। আমার জীবন তো এমনেই শেষ হইয়া গেছে। বাপ মরছে বড়ভাই মরছে। মা আর বইনগুলোও মনে হয় বাঁইচা নাই। ছোট ভাইটাও হয়তো মরছে। তয় আর আমার একলা বাঁইচা থাকনের অর্থ কী? আমি একজন নামকরা হেডমাস্টারের পোলা। জীবন বাঁচানের জন্য ওই রকম বাপের পোলার তো জবান নষ্ট করন ঠিক হইব না।

ওই রাতটা আমাদের সঙ্গে থাকলো রুনু।

সবাই মিলে অনেক বুঝালাম তাকে। তুই যাইচ না রুনু, তুই তোর জানটা বাঁচা।

মানুষ যে নিজের জীবনকে এত তুচ্ছ করতে পারে সেই প্রথম আমি তা টের পেলাম। সতেরো আঠারো বছরের একজন যুবকের কাছে জীবনের চেয়ে যে তার জবানের দাম বড় ওই প্রথম আমি তা দেখলাম।

রুনু কোনও কিছু কেয়ারই করলো না। পরদিন সকালে বলতে গেলে হাসি মুখেই চলে গেল কংশনদীর ওপারকার আর্মি ক্যাম্পে।

রুনুর জন্য আমি খুব কেঁদেছিলাম।

রুনুর সঙ্গে ওই আমার শেষ দেখা।

কংশনদীর ওপারকার আর্মি ক্যাম্প থেকে রুনু আর কখনও ফিরে আসেনি।

জব্বারদের ক্যাম্পে পাগলাটে ধরনের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। কাছাকাছি এলাকার বেশ বড় ঘরের ছেলে। বাপ হয়েছে শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান, ছেলে হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা।

আমি সেদিন ক্যাম্পে।

সেই ছেলেটা জব্বারের কাছে এসে বলল, আজ রাতেই সে তার বাপকে মারতে চায়।

জব্বার বলল, পারবি?

অবশ্যই পারবো।

Munshigonj.com

তয় বাড়িতে গিয়া মারনের কাম নাই। আমগ ক্যাম্পে ধইরা লইয়া আয়।

সত্যি সত্যি রাত দুপুরে মুক্তিযোদ্ধা ছেলে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে এলো শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান বাপকে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে গামছায় চোখ বাঁধা শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান। মুক্তিযোদ্ধা ছেলে তার দিকে রাইফেল তাক করলো।

জব্বার বলল, এই রকম মাইনষের লেইগা গুলিগ্ন খরচা করনের কাম নাই। বাইড়াইয়া মার শুয়োরের বাচ্চারে।

অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

সেই ছেলে একা পিটিয়ে মারলো বাপকে।

পাশাপাশি দুটো ঘটনা। জামিনদারের জন্য নিজের জীবন দিতে চলে গেল রম্ননু। আর মুক্তিযোদ্ধা ছেলে পিটিয়ে মারলো স্বাধীনতা বিরোধী বাপকে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তখন চলে গেছে তুঙ্গে। পাকিস্তান আর্মি গেছে দিশেহারা হয়ে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাদের। ঈশ্বরগঞ্জ ক্যাম্প থেকে একদিন কয়েক গাড়ি ভরে মিলিটারি গেল হালুয়াঘাটে। কোনও রকমে জান বাঁচিয়ে ফিরতে পারলো মাত্র কয়েকজন। বাকিগুলোকে সাবাড় করে দিয়েছে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা।

ঈশ্বরগঞ্জ ক্যাম্পে অদ্ভুত ধরনের একজন পাকিচ্চানী সোলজার ছিল। লোকটার নাম লাল খাঁ। সে কখনও আর্মির পোশাকই পরতো না। সবসময় সাধারণ পোশাক। পাকিস্তানী সিল্কের প্রিন্ট করা লুঙ্গি আর ঢোলাঢালা কামিজ পরতো। পায়ে চপ্পল। এই পোশাকে সে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতো। গরিব মানুষের সঙ্গে গিয়ে তামাক খেতো, বাচ্চা কাচ্চাদের সঙ্গে গিয়ে মাঠে ফুটবল খেলতো।

আমার সঙ্গে কেমন কেমন করে একটু খাতির হলো লাল খাঁর।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এইভাবে ঘুইরা বেড়াও, মুক্তিযোদ্ধারা যদি তোমারে গুলি করে মারে?

লাল খাঁ বলল, আমারে কেউ মারবো না। কারণ আমি কাউরে মারি নাই। বাঙালি জাতি কোনও অন্যায় করে নাই। অন্যায় করতাছি আমরা। নিরীহ মানুষের ওপর আমরা জুলুম চালাইতাছি। এইটা আমাদের অন্যায়।

লাল খাঁ কথা বলতো বাংলা উর্দু মিশিয়ে। উর্দুর সঙ্গে কিছু কিছু বাংলা শব্দ। তার কথাবার্তা আমরা পরিষ্কারই বুঝতাম। কামিজের পকেট থেকে প্রায়ই সে আমাদেরকে চিঠি বের করে দেখাতো। এই যে দেখ, দেশ থেকে চিঠি আসছে। আমার বউ কান্নাকাটি কইরা চিঠি লিখছে। একটা ছোট বাচ্চা আছে আমার। বাচ্চাটার কথা খুব মনে হয়। তারে খুব দেখতে ইচ্ছা করে।

বাচ্চার একটা ছবি থাকতো লাল খাঁর পকেটে। আমাকে একদিন সেই বাচ্চার ছবিও দেখালো। ফুটফুটে সুন্দর এক শিশুমুখ। দেখে আমার মনে হলো পৃথিবীর সব শিশুর মুখ একই রকম পবিত্র। কোনও শিশুর

Munshigonj.com

মুখেই কোনও পাপচিহ্ন থাকে না। শত্রুতা মিত্রতার চিহ্ন থাকে না। শত্রুর সন্তানকে দেখেও ইচ্ছা করে তার মুখটা বুকে চেপে ধরি। কপালে চুমু খেয়ে বলি, মানুষ হও।

মানুষের বয়স বাড়ে। শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয় তারা। কিন্তু অনেক মানুষই আর মানুষ হয় না। দেখতে মানুষের মতো, আসলে জন্তু। যেমন ছিল একাত্তোরের পাকিস্তানী মিলিটারিরা।

লাল খাঁ ছিল বেলুচিস্তানের লোক।

বেলুচ রেজিমেন্টকে মিথ্যে বলে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল ইয়াহিয়া সরকার। তাদেরকে বলা হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে চাইছে হিন্দুরা। পাকিস্তানের অন্যান্য রেজিমেন্টের সঙ্গে তোমরাও যাও পূর্ব পাকিস্তানে। গিয়ে হিন্দুদেরকে মারো। পূর্ব পাকিস্তানকে বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করো। দুই পাকিস্তানই মুসলমানদের দেশ। পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুদের হাতে তুলে দিও না, দেশটাকে রক্ষা করো।

একথা জেনে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল বেলুচ রেজিমেন্ট। এই রেজিমেন্টের সোলজাররা যখন তেজগাঁ এয়ারপোর্টে এসে নেমেছে, গাড়ি চরে যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে, তখন শোনে চারদিককার মসজিদে মসজিদে আজান হচ্ছে। আজানের শব্দ শুনে তারা চমকে উঠেছে। পরস্পর চাওয়া চাওয়ি করেছে পরস্পরের মুখের দিকে। উচ্চপদস্থরা বলাবলি শুরু করলো, আমাদেরকে যে বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে কোনও মুসলমান নেই, পূর্ব পাকিস্তান চলে গেছে হিন্দুদের হাতে, এদেশে তাহলে আজান হচ্ছে কেমন করে? চারদিকে এত আজানের শব্দ!

পরে আস্তে ধীরে খবর নিয়েছে তারা। খবর নিয়ে জেনেছে, ইয়াহিয়া সরকার তাদেরকে মিথ্যে বলে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে অতি সামান্যই হিন্দু। এবং তারা অতিশয় নিরীহ। পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সংখ্যা শতকরা আশি ভাগ।

এই তথ্য জানার পর বেলুচ রেজিমেন্টে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। নিরীহ নিরস্ত্র মুসলমানের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে না। তারা ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো।

কিন্তু চাইলেই তো ফিরে যাওয়া যায় না। আর্মির নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাম্পে যেতে হলো তাদের। কোথাও কোথাও দু চারজন হিন্দু মারলো তারা। কিন্তু বেশির ভাগ বেলুচ সোলজারই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেনি।

এই তথ্য কথাটা সত্য আমি জানি না। লাল খাঁর কথায় আর আচরণে কিছুটা বিশ্বাস করেছিলাম।

লাল খাঁ একদিন আমাকে বলল, সে হালুয়াঘাট যাচ্ছে। মানে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ক্যাপ্টেনের আদেশ অমান্য করার সাধ্য তার নেই। সুতরাং সে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধ করবে না। সে অবশ্যই ফিরে আসবে। যুদ্ধে তার মৃত্যু হবে না, কারণ সে কোনও মানুষ হত্যা করেনি।

যাওয়ার সময় পরিষ্কার তার চোখে পানি দেখলাম আমি।

কিন্তু লাল খাঁ আর ফিরে আসেনি। হালুয়াঘাটের যুদ্ধে লাল খাঁ মারা যায়। একজন সৎ পাকিস্তানী সৈনিকের মৃত্যু আমাকে কিছুটা দুঃখি করেছিল।

Munshigonj.com

মাঝে মাঝে সারারাত আমার মা উঠোনে বসে নামাজ পড়তো।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত হোক কিংবা গভীর অন্ধকার রাত হোক, জায়নামাজের সামনের দিকে একটা মোমবাতি জ্বেলে রাখতো মা আর নামাজ পড়তো। এরকম খোলা জায়গায় বসে আল্লাহকে ডাকার মধ্যে তার এক মানসিক প্রশান্তি কাজ করতো।

ততোদিনে আমাদের দুজন মানুষের সংসারে আবার লেগেছে অভাব অনটন। মার সইয়ের পাঠানো চাল ডাল আনাজপাতি সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদের দিন চলে অতিকষ্টে। চারদিকে তখন ভয়াবহ যুদ্ধের ডামাডোল। পুম্বাইল থেকে যে মাউই মা আবার বস্তা ভরে চাল পাঠাবে, তিন চারজন কামলা মজুর দিয়ে পাঠাবে সংসার চালাবার অন্যান্য দ্রব্য সেসবের কোনও উপায়ই নেই।

আমাদের পুরো পাড়াটাতেই চলছে এই রকম অভাব অনটন।

ভালোর মধ্যে কিছুটা ভালো আছে মোচ্চফারা। আমাদের মস্তু। বাজারে ওদের একটা কাপড়ের দোকান আছে আর একটা মুদি দোকান। কাপড়ের দোকানটা বন্ধ পড়ে আছে, মুদি দোকানটা খুলেছে মস্তুর বাবা। টুকটাক কিছু বিক্রিবাটাও হয়। ওই দিয়ে মস্তুদের সংসার চলে। কিন্তু অন্য প্রত্যেকটা বাড়িতেই অভাব।

ওই সময়কার এক রাতের ঘটনা।

উঠোনে নামাজ পড়ছেন মা। সেজদা দিয়ে পড়ে আছেন। কতক্ষণ সেজদায় থাকবে মা নিজেই তা জানে না। আমি শুয়ে আছি আক্কাসের বাড়ি থেকে আনা সেই ছয়খানা টিনের নড়বড়ে চালার তলায়। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছি। আনমনা চোখে সেজদা দেয়া মাকে দেখছি। মার মাথার কাছে পিটপিট করে জ্বলছে অর্ধেক শেষ হওয়া মোমবাতি।

হঠাৎ কাছে কোথাও শুনি, গটগট করে শব্দ হচ্ছে। প্রথমে বুঝতে পারি না শব্দটা কিসের। পরমুহূর্তে বুঝে যাই মিলিটারিদের বুটের শব্দ।

তার মানে মিলিটারিরা ঢুকেছে আমাদের পাড়ায়?

আমি চিৎকার করে মাকে ডাকলাম, মা তাড়াতাড়ি ওঠো। মিলিটারি আসতাছে।

মার কোনও সাড়া নেই।

আমি দুবার তিনবার ডাকলাম।

মা সেজদা থেকে উঠলোই না।

Munshigonj.com

আমি আর কী করি! অন্ধকারেই দৌড়ে চলে গেলাম বাড়ির পিছন দিকটায়। সেই ট্রেঞ্চে গিয়ে ঢুকলাম।

ভয়ে হাতপা কাঁপছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ওদিকে আর্মি ততোক্ষণে আমাদের উঠানে। উঠানে এসে দেখে সেজদায় পড়ে আছে আমার মা। মাথার কাছে জ্বলছে আধপোড়া মোম।

মাকে এই অবস্থায় দেখে মিলিটারিরা একটু থমকালো তারপর চারদিকে টর্চ ফেলে ফেলে দেখতে লাগলো সবকিছু। আমাদের নড়বড়ে চালা, শূন্য আঙিনা, সব দেখে সেজদা দেয়া মাকে টেনে তুলল। আপকা এক বেটা হায়ঃ

শুনে মা মনে করল, আমাকে খুঁজতে আসছে মিলিটারিরা। ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে।

সে হাউমাউ করে কান্না শুরু করল।

ট্রেঞ্চে বসে মায়ের কান্নার শব্দটা আমি শুনতে পেলাম। শুনে আশ্চর্য এক অনুভূতি হলো। আমাকে না পেলে তো আমার মাকেই ওরা গুলি করে মারবে। আমি বেঁচে থাকবো আর আমার মাকে ওরা মেরে ফেলবে?

না না, এটা হওয়া ঠিক হবে না। আমি যাবো, আমিই মিলিটারিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। মারতে হলে আমাকেই মারুক ওরা।

এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, আমার হাত পায়ের কাঁপন বন্ধ হয়ে গেছে। বুকের ভেতর কোত্থেকে এসেছে অদৃশ্য এক সাহস। হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে আমি যেন আমি না, আমি যেন আসলে রুনু হয়ে গেছি। আমার সেই বন্ধু রুনু, মা বাবার খোঁজে আর্মি ক্যাম্পে একজনকে জামিনে রেখে পাঁচদিনের জন্য বেরিয়ে এসেছিল। আমরা হাজারবার বলার পরেও নিজের জীবনের কথা সে ভাবেনি। জামিনদারকে বাঁচাতে ফিরে গিয়েছিল সেই আর্মি ক্যাম্পে।

রুনু বাঁচাতে গিয়েছিল জামিনদারকে, নিজের জীবনের বিনিময়ে। আর আমি আমার জীবনের বিনিময়ে নিজের মাকে বাঁচাবো না?

ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে উঠানে এসে দাঁড়ালাম মিলিটারিদের সামনে।

আমাকে দেখে মায়ের কান্না আরও বেড়ে গেল। দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে আমাকে আড়াল করে দাঁড়াল।

একজন অফিসার তীক্ষ্ণচোখে আমার দিকে তাকালো। ইয়ে কোন হায়?

মা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ওরে মাইরেন না বাবারা, ও আমার ছোটছেলে। আমরা দুজনই আছি। আর কেউ বাঁইচা আছে না মইরা গেছে জানি না।

অফিসার বাংলা উর্দু মিশিয়ে বলল, আপকা কই ডার নেহি হায়। হামলোগ মার নে কে লিয়ে নেহি আয়া।

Munshiganj.com

তারপর পকেট থেকে কিছু টাকা বের করল। আপকা এক বেটা হায়, দাউদ কোম্পানি মেঃ

ঘটনা কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। যে অফিসার কথা বলছে সে আসলে একজন মেজর। আজই ঢাকা থেকে ঈশ্বরগঞ্জে এসেছে। ঢাকায় দাউদ কোম্পানির অফিসে বড়ভাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। কথায় কথায় সে বড়ভাইকে বলেছিল তাকে যেতে হচ্ছে ঈশ্বরগঞ্জে। শুনে বড়ভাই করেছে কি, সেই মেজরকে কিছু টাকা দিয়েছে, দিয়ে বলেছে, ঈশ্বরগঞ্জ ডাকবাংলোর ক্যাম্পের খুব কাছে আমাদের বাড়ি। সেই বাড়িতে আমার মা, ছোটভাই আর ছোটবোন আছে। আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি তা তারা জানে না। তাদের সংসারেও খুব অভাব। এই টাকাটা তুমি আমার মায়ের হাতে পৌঁছে দিও। রাত দুপুরে মেজর তার বাহিনী নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছে সেই টাকা পৌঁছে দিতে।

শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি আর আমার মা। একদিকে ভাই যে ভাবী বাচ্চা আর ছোটবোনকে নিয়ে বেঁচে আছে এটা নিশ্চিত হলাম, অন্যদিকে ভাইয়ের পাঠানো টাকায় দুজন মানুষ বেশ কিছুদিন খেয়ে পরে বাঁচতে পারবো।

মনে আছে, বারোশো টাকা পাঠিয়েছিল ভাই। একাত্তোর সালে বারোশো টাকা মানে বিশাল ব্যাপার। দুজন মানুষের তিন চারমাস চলে যাবে।

মার হাতে টাকাটা দিয়ে মেজর তাকালো তার সঙ্গে আসা মিলিটারিদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চটের বড় একটা ব্যাগ হাতে একজন এগিয়ে এলো। সেই ব্যাগ থেকে একে একে বেরহলো সাদা দুখানা ধুতি, বাঁশপাতার শক্তঠোঙায় সুতলি দিয়ে বাঁধা তিন চারসের চিনি, আর বিশাল বিশাল দুটো লিপটন চায়ের প্যাকেট।

সেই মেজরের সঙ্গে ভাই এসব জিনিসও পাঠিয়েছে।

চলে যাওয়ার সময় মেজর জিজ্ঞেস করলো, আপনার ছেলে বলেছিল, তার একটা বোনও আছে এই বাড়িতে। অর্থাৎ আপনার মেয়ে, সে কোথায়?

মা বলল, সে আছে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

মেজর বলল, ইচ্ছা করলে সে এই বাড়িতে এসেও থাকতে পারে। আপনাদের কোনও ক্ষ্তি কেউ করবে না।

মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর মা আবার সেজদায় পড়লো। অনেক কান্নাকাটি করলো আলস্নাহর কাছে। শোকর গুজার করলো।

আমার মনে যে তখন কী আনন্দ। যাক আমার ভাইটা বাঁইচা আছে।

পরদিন অল্পকিছু টাকার বাজার করে দিলাম মাকে। সংসারে যা যা লাগে কিনেকেটে দিয়ে নিজে বেরিয়ে গেলাম খবর সংগ্রহের কাজে।

মিলিটারি আর রাজাকাররা তখন নিজেরাই আছে বেশ পেরেশানির মধ্যে। এখন আর মেয়ে টেয়ে ধরে এনে

ফুর্তি করার সময় নেই তাদের। তারা পাগলের মতো ঘুরছে মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজে। মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে দুচারজন সাধারণ মানুষ ধরে নিয়ে আসে, এনে ভয়ানক টর্চার করে। ডাকবাংলোর আঙিনায় একটা জাম্বুরা গাছ ছিল। পা উপরের দিকে, মাথা নিচের দিকে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মনে করে নিরীহ লোকগুলোকে ঝুলিয়ে রাখতো। লোকগুলোর কী যে চিৎকার, কী যে আর্তনাদ আমার কানে আসতো। ঢুফির বাজারে গিয়ে জব্বারদেরকে এসব জানিয়ে আসতাম।

একদিন একটা বিভৎস্য দৃশ্য চোখে পড়ল।

তার আগের রাতে অনেকদিন পর একটা মেয়ের চিৎকার শুনেছিলাম আর্মি ক্যাম্পে। বাবা গো, বাবা গো, মইরা গেলাম গো। আমারে ছাইড়া দাও, তোমরা আমার বাবা।

পরদিন সকালে স্টেশনের দিকে গেছি, রাস্তার ধারে দেখি একজন যুবতী মেয়ের লাশ পড়ে আছে। শরীরের এদিক ওদিক রক্তমাখা। মুখটা হা হয়ে আছে। কোনও রকমে একটা কাপড় প্যাঁচিয়ে ঢাকা হয়েছে তার লজ্জাস্থান। পথচারিরা আড়চোখে দেখছে লাশ। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াচ্ছে না, দ্রুত হেঁটে পেরিয়ে যাচ্ছে জায়গাটা।

সেদিনই ঢুফির বাজার গিয়ে ঘটনাটা বললাম জব্বারকে।

জব্বার গম্ভীর গলায় বলল, আর মাত্র কয়টা দিন।

কথা বলবার সময়, লক্ষ্য করলাম জব্বারের চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে, দাঁত কিড়মিড় করছে। অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করতে করতে নিজের চুল যেন নিজেই টেনে ছিঁড়ে ফেলছে।

গৌরিপুর রাজবাড়িতেও ক্যাম্প করেছে মুক্তিযোদ্ধারা।

কিন্তু শম্ভুগঞ্জ ব্রিজের ওখানে ভয়াবহ নরহত্যা চালাচ্ছে পাকিস্তান আর্মি। ট্রেন ভরে, মালগাড়ি ভরে, মানুষ ধরে ধরে আনছে কোন কোন জায়গা থেকে। ব্রিজের কাছে এনে লাইন করে দাঁড় করাচ্ছে। তারপর পাখির মতো গুলি করে মারছে। কিশোরগঞ্জ থেকে, আঠারো বাড়ি থেকে, সোহাগী থেকে মানুষ এনে শম্ভুগঞ্জ ব্রিজের ওখানে মারছে। মেরে ফেলে দিচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদীতে। মানুষের পঁচা লাশ খাচ্ছে কাক, কুকুরে।

আমি একদিন আর্মির হাতে ধরা পড়ে গেলাম।

খানিক আগে ঢুফির বাজার থেকে ফিরেছি। সকালবেলা দৌড়ে গেছি জব্বারদেরকে এই এলাকার খবর জানাতে। তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর ছিল না। তবু নিয়ম মাফিক যা জানাবার জানিয়ে এলাম। যেমন দৌড়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম, তেমন দৌড়ে দৌড়েই ফিরে এসেছি। তারপরও দেখি দুপুর প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এমন খিদা লেগেছে, বাড়ি ঢুকে দেখি মা রান্নাবান্না গোসল সেরে জোহরের নামাজ পড়ার জন্য তৈরি হয়েছে। চালার তলায় মাত্র জায়নামাজ বিছিয়েছে, আমি বললাম, খুব খিদা লাগছে মা, তাড়াতাড়ি ভাত দাও।

মা বলল, নামাজ পড়া শেষ করি, তারপর।

Munshigonj.com

আমার আর খিদা সহ্য হচ্ছিল না। তারপরও মার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। পুকুরে গিয়া একটা ডুব দিয়ে এলাম। গামছায় শরীর মাথা মুছে, লুঙ্গি পরে বাড়ির বাইরের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ওখানটায় একটা বেলগাছ, প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে। কোনও কোনও সময় ওই গাছটায় আমরাও চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তাম। বেলগাছে বড় বড় কাঁটা থাকে। সেইসব কাঁটা থাকে মাথার দিককার সরন্ন সরন্ন ডালপালায়, গোড়ার দিকটায় থাকে না। সুতরাং আরাম করেই শোয়া যেত গাছটার ওপর।

পেটের খিদা চেপে রাখার জন্য বেলগাছটাকে কোলবালিশের মতো জড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি আমি। নামাজ শেষ করেই ভাত বাড়বে মা, আমাকে ডাকবে। সেই অপেক্ষায় আছি।

প্রচণ্ড খিদায় একটু কী তন্দ্রামতো আসে মানুষের? নাকি শরীর অবসন্ন হয়ে কোনও একটা ঘোর তৈরি হয়? আমারও বোধহয় তেমন কিছু হয়েছিল। সেই ঘোরের মধ্যে হঠাৎ শুনি আমার খুব কাছে চারদিকেই ছুটোছুটি করছে অনেকগুলো বুটপরা পা। বাড়ির সামনের রাস্তাটা দিয়েও যেন এগিয়ে আসছে ওরকম অনেক বুটের শব্দ।

চট করেই গাছ থেকে নেমেছি।

নেমে দেখি, চারদিকেই মিলিটারি। এস এম জি, এল এম জি বুকের কাছে ধরা, কারও হাতে রাইফেল, কারও হাতে স্টেনগান। আমাদের পুরো পাড়া ঘেরাও করে ফেলেছে। খালি গায়ে লুঙ্গিপরা আমি। আমার চুল থাবা দিয়ে ধরলো একজন। ধরে সমানে থাপ্পড়, সমানে লাথি। এমনিতেই ক্ষুধায় কাতর, তার ওপর ওরকম মার! চোখের সামনে হাজার হাজার সর্ষে ফুল দেখছি আমি। আমার মাথা ঘুরছে, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। সর্ষে ফুলের জায়গায় চোখে নেমে আসছে ঘোরতর অন্ধকার।

আস্তে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছি।

ওই অবস্থায়ও মুহূর্তকালের জন্য আমার মনে হলো, আমি যে মুক্তিযোদ্ধাদের ইনফরমার, মিলিটারিরা কী সেই কথা জেনে গেছে?

তাহলে তো আমার বাঁচার আর কোনও পথ নেই।

এখনই গুলি করে মারবে আমাকে।

তখনই আরেকজন রাইফেলের বাট দিয়ে ধামাধাম কয়েকটা বারি মারলো পিটে। তীব্র যন্ত্রণায় প্রাণ ফাটানো চিৎকার দিচ্ছি আমি।

আমার মা সেই মুহূর্তে কোথায়, পাড়ার লোকজন কে কোথায়, কিছুই আমি জানি না।

মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।

কিন্তু জ্ঞান হারায়নি।

Munshigonj.com

জ্ঞান আমার আছে।

নাকমুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। উপুড় হয়ে পড়ার ফলে মুখের কাছটায় রক্তে ভিজে উঠেছে মাটি। সেই অবস্থায় দেখি, বুকের কাছে এস এম জি ধরে মিলিটারিদের একজন এগিয়ে এলো আমার কাছে। চুল ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বসিয়ে ফেলল আমাকে। বইঠ, ছালা ছুয়ার কি আওলাদ।

মাটিতে অসহায় ভঙ্গিতে বসে রক্তমাখা মুখ নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে মিলিটারির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আমার তখন একটাই কথা মনে পড়ছে। মৃত্যু আমার আর কতটা দূরে? কখন গুলিটা ওরা করবে? কোন মুহূর্তে এই পৃথিবী ছেড়ে যাবো আমি?

আমার তখন মার কথা মনে পড়ে না, ভাইবোনদের কথা মনে পড়ে না। বন্ধুবান্ধব কিংবা প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে না। দিলুর কথাও মনে পড়ে না। মৃত্যু ভয়ে আলস্নাহকে ডাকতেও ভুলে যাই আমি।

ক্যাপ্টেন বা মেজর ধরনের একজন অফিসার এলো এসময়। মুঠি করে ধরলো আমার চুল। টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেল রাচ্চায়। নিয়ে আবার সেই গালাগাল, বইঠ, ছালা ছুয়ার কি আওলাদ।

বসতে গিয়ে দেখি, আমার মতন অনেক মানুষ লাইন ধরে বসে আছে। মিলিটারিরা আরও মানুষ ধরে আনছে। আরও মানুষকে লাইন ধরে বসাচ্ছে। লাইন শুধু লম্বাই হচ্ছে।

নাকমুখের ব্যথা রক্ত এসবের কিছুই আমি আর টের পাচ্ছি না। শুধু টের পাচ্ছি বাঁপায়ের বুড়ো আঙুলটায় কী রকম একটা জ্বলুনি, কী রকম একটা ব্যথা। মুমূর্ষু চোখে তাকিয়েছি। দেখি, বাঁপায়ের বুড়ো আঙুলের পুরো নখটা ওঠে গেছে। টপটপ করে রক্ত পড়ছে সেই আঙুল থেকে।

ওদিকে একটার পর একটা সাধারণ মানুষ ধরে আনছিল মিলিটারিরা। বাড়ির ভিতর থেকে, বাড়ির বাইরে থেকে। পুকুরে গোসল করতে নেমেছিল লোক, ভেজা কাপড়ে তাদেরকেও ধরে এনেছে। কেউ কেউ সাবান মেখে গোসল করছিল, গায়ে তখনও রয়ে গেছে সাবানের ফেনা।

কতড়্গণ পর দেখি, আমার মাকেও ধরে এনেছে।

কিন্তু মিলিটারিরা কাউকেই মারছে না, কাউকেই কোনও টর্চার করছে না, কিছু বলছেও না। শুধু পাড়ার আণ্ডাবাচ্চা থেকে শুরম্ন করে সব মানুষ ধরে এনে পুকুরপাড়ে লাইন ধরে বসিয়েছে। লাইন করেছে দুটো। একলাইনে পুরম্নষ, আরেক লাইনে মহিলা।

আমরা যে পুকুরপাড়ে বসে আছি, তার পাশেই রেললাইন। হঠাৎ রেলগাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া গেল। তাকিয়ে দেখি, স্টেশনের দিক থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা মালগাড়ি। আমরা সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। সবাই বুঝে গেছে, আমাদেরকে এখন এই মালগাড়িতে তোলা হবে। বগি ভরে ভরে নিয়ে যাওয়া হবে ময়মনসিংহের দিকে। শম্ভুগঞ্জ ব্রিজের কাছে নিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে আবার লাইন ধরে দাঁড় করাবে। সামনে ব্রক্ষ্মপুত্র নদী, পিছনে পাকিচ্চান আর্মি। ট্যা ট্যা করে গুলি ছুঁড়বে। আর আমরা একেকজন লুটিয়ে পড়বো ব্রক্ষ্মপুত্রের জলে। পরদিন আমাদের লাশ ভাসতে থাকবে নদীর এদিক

Munshigonj.com

এদিক। পানি সাঁতরে কুকুররা যাবে না সেই লাশ খেতে। ক্ষুধার্ত কাকগুলো উড়ে উড়ে গিয়ে বসবে আমাদের লাশের ওপর। ঠুকরে ঠুকরে খাবে আমাদের চোখ নাক ঠোঁট।

আমার তখন মার মুখটা দেখতে ইচ্ছা করছে।

কই, কোথায় আমার মা?

ওই তো, ওই যে দূরে বসে আছে।

আমাকে তাকাতে দেখে মাও তাকিয়েছে আমার দিকে। চিৎকার করে বলল, ডরাইস না বাজান। কিছু হইব না। আলস্নারে ডাক।

আমার শরীরে তখন কোনও রকমের কোনও অনুভূতি নেই। আলস্নাহকে ডাকার ক্ষমতাও যেন লোপ পেয়েছে।

এসময় একজন আর্মি অফিসার এগিয়ে এলো।

ছফুটের মতো লম্বা। টকটকে ফর্সা গায়ের রং। চেহারা খুব সুন্দর। সে এসে ইংরেজিতে বলল, তোমাদের মধ্যে ভালো উর্দু কে জানে?

আমাদের মস্তুর এক বোনজামাই ঢাকায় থাকতো। মুক্তিযুদ্ধ শুরম্ন হওয়ার পর ঈশ্বরগঞ্জে চলে এসেছে। সেও বসেছিল আমাদের সঙ্গে লাইন ধরে। অফিসারের কথা শুনে উঠে দাঁড়াল, ম্যায় জানতা হো।

মস্তুর বোনজামাই গোসল করতে নেমেছিল পুকুরে। ওই অবস্থায় তাকে ধরে আনা হয়েছে। লোকটার শরীর মাথা সবই ভিজা।

আর্মি অফিসার তাকে উর্দুতে বলল, তুমি সবাইকে বুঝিয়ে বলো, আমরা তোমাদেরকে ধরেছি একটা বিশেষ কারণে। পাকিস্ত্মান আর্মির একজন বাঙালি কর্নেল, তার নাম কর্নেল তাহের। সে পশ্চিম পাকিস্ত্মান থেকে পূর্ব পাকিস্ত্মানে পালিয়ে এসেছে। আমরা শুনেছি এই এলাকায় সে গা ঢাকা দিয়ে আছে। ধারণা ছিল তোমাদের মধ্যেই একজন সেই কর্নেল তাহের। আমরা নানা রকমভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম, তোমাদের মধ্যে কর্নেল তাহের নেই। কিন্তু আমরা এও জানি, এই পাড়াতেই কর্নেল তাহেরের শ্বশুরবাড়ি। তার শ্বশুর খুবই নামকরা ডাক্তার। ঠিক আছে, তোমরা যাও, তোমরা মুক্ত।

কর্নেল তাহেরের শ্বশুর, সেই হৃদয়বান বিশাল মাপের ডাক্তার মানুষটিকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল ডাক্তার সাহেবের আরেক মেয়ে নিলুফারকে।

কর্নেল তাহেরের স্ত্রীর নাম লুৎফা। আমি ডাকতাম লুৎফা আপা।

নিলুফার ছিল আমার বন্ধু।

Munshigonj.com

পুরোনাম নিলুফার ইয়াসমিন। সাবিনা ইয়াসমিনের বড়বোন, খান আতাউর রহমানের স্ত্রী, বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী নিলুফার ইয়াসমিনের সঙ্গে আমার বন্ধু এই নিলুফার ইয়াসমিনের বেশ একটা মিল ছিল। আমাদের নিলুফারও গান গাইতো। আমি গান গাই, নিলুফার গান গায়। যখন তখন ওদের বাড়িতে ছুটে যাই আমি। পেয়ারাগাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে পেয়ারা ভাগ করে খাই দুজনে। বাড়ির ছেলের মতোই সবাই আমাকে ভালোবাসে। লুৎফা আপা যখন বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসে তখন আমাদের কত আবদার, আপার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে কত যে চকলেট বিস্কুট খেয়েছি! রসোগোলস্না খাওয়ার টাকাও অনেকবার দিয়েছেন লুৎফা আপা।

আর ডাক্তার সাহেবের তো কোনও তুলনাই ছিল না। এলাকার গরিব দুঃখি মানুষের চিকিৎসা করতেন বিনা পয়সায়। ফার্মেসি খালি করে গাদা গাদা ওষুধ দিয়ে দিতেন রোগীদের। পয়সা নিতেন না।

এইরকম একজন মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর্মি? সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের নিলুফাকে?

ভয়ে আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে আছে নিলুফা। বাবার পাশে যখন তাকে গাড়িতে বসিয়েছে মিলিটারিরা, নিঃশব্দে কাঁদছিল নিলুফা। সেই অবস্থায় আমার দিকে একবার চোখ পড়ল। কী যে করম্নণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে, আমার বুকটা তোলপাড় করতে লাগলো।

মিলিটারিরা যাদেরকে ধরে নিয়ে যায় তারা কি আর ফিরে আসে?

নিলুফা কি ফিরে আসবে?

ডাক্তার সাহেব কি ফিরে আসবেন?

মনে আছে, এই দুজন মানুষের জন্য আমি আলস্নাহর কাছে অনেক কেঁদেছিলাম। আলস্নাহ তুমি তাদেরকে সহি সালামতে রেখো, তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখো, তাদেরকে ইজ্জতের সঙ্গে ফিরিয়ে এনো।

পরের দিন কর্নেল তাহেরের মা এলেন আমাদের এলাকায়। তিনি খবর পেয়েছিলেন তার বিয়াই আর বিয়াইয়ের মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারিরা। তাদের বাড়ি হচ্ছে শম্ভুগঞ্জের ওদিককার এক গ্রামে। সাত ছেলের জননী তিনি। অসম্ভব ব্যক্তিত্বময়ী, দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে এমন একজন মানুষ। তিনি এসেছেন শুনে গ্রামের মানুষজন একত্রিত হয়েছে। সেই মানুষজনের সামনে দাঁড়িয়ে অসাধারণ কিছু কথা বললেন তিনি। আমার সাতছেলে, সাতজনকেই যুদ্ধে পাঠিয়েছি। এদেশের প্রতিটি যুবক আমার ছেলে। এদেশের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা আমার ছেলে। যদি আমার সাতছেলের সাতজনই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়, যদি সাতজনই প্রাণ দেয় দেশের স্বাধীনতার জন্য, আমার একটুও দুঃখ হবে না। আপনাদের এলাকার যার যেটুকু সামর্থ্য আছে, তাই নিয়ে আপনারা পাকিস্থানীদের বিরম্নদ্ধে লড়াই শুরম্ন করম্নন। একজনও বসে থাকবেন না। আপনারা কী করছেন? বসে আছেন কেন? যুদ্ধে যাচ্ছেন না কেন?

মানুষজন সব উদ্দীপ্ত হয়ে গেল।

তিনি বললেন, মানুষের যেমন মা বাবার প্রতি দায় থাকে, মা বাবার কাছে যেমন ঋণী থাকে সন্তান, দেশের কাছেও ঠিক সেইরকম ঋণ থাকে মানুষের। মনে রাখতে হবে, এই দেশের কাছে, এই মাটির কাছে আপনারা সবাই ঋণী। এই এক সুযোগ আপনারা যুদ্ধে চলে যান। দেশ স্বাধীন করে দেশ এবং মাটির ঋণ শোধ

Munshigonj.com

করলেন।

একজন সত্যিকার মায়ের চেহারা কেমন হয়, কর্নেল তাহেরের মাকে দেখে আমি সেদিন বুঝেছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগুচ্ছে। চারদিক থেকেই আসছে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের সংবাদ। পাকিস্তান আর্মির খুবই নাস্তানাবুদ অবস্থা। সোহাগী বাজারে হঠাৎ করে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তান আর্মির বেশ কয়েকজনকে মেরে ফেলল মুক্তিযোদ্ধারা। রামগোপালপুরেও ঘটল একই ঘটনা। ভৈরবের দিকে পাকিস্তান আর্মির বিরাট এক দলকে ছিন্নভিন্ন করে দিল মুক্তিযোদ্ধারা। এখন যে কোনওদিন আক্রমণ চলবে ঈশ্বরগঞ্জ ক্যাম্পে।

ঢুফির বাজারে জব্বারদের খবর নিতে গেছি।

গিয়ে দেখি ক্যাম্প নেই। ক্যাম্প ওঠে গেছে। কোথায় চলে গেছে আমার মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা, কিছুই বুঝতে পারছি না। হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।

গ্রামে এসে শুনি আরেক দুঃসংবাদ। আক্কাস বদমাশটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ করে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে সে। রাজাকার আলবদর আলশামস সব মিলে শান্তিবাহিনী। শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান ওসমান গনি বহাল তবিয়তে আছে। নেই শুধু আক্কাস। বাড়িতে বউ বাচ্চা সবাই আছে, আক্কাস উধাও।

কোথায় গেল সে?

কেন গেল?

আমার মন হতাশায় ভরে গেল। আক্কাসের ওপর কি আমার সেই প্রতিশোধ নেয়া হবে না? আমাদের বাড়ি লুট করেছিল, সেই লুটের প্রতিশোধ কি আমি নেবো না?

আক্কাসের কথা ভেবে সেই রাতটা আমি আর ঘুমাতেই পারলাম না।

কর্নেল তাহেরের শ্বশুর, সেই মহান ডাক্তারের নাম খোরশেদ আলম।

তাঁকে এবং তাঁর মেয়ে নিলুফারকে দুদিন পর সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মিলিটারিরা। তাদের গায়ে ফুলের টোকাটিও দেয়নি।

এইভাবে পাচ্চিান আর্মির হাত থেকে ফিরে আসা সত্যি খুব বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু ডাক্তার সাহেব আর তাঁর মেয়ে ফিরে এসেছিলেন। বোধহয় মানুষের ভালোবাসায় আলস্নাহ তাঁদেরকে প্রিয় মানুষের কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

Munshigonj.com